দাম : সাত টাকা
৬৫ বর্ষ, ৪ সংখ্যা ।। ৩ সেপ্টেম্বর - ২০১২
১৭ ভাদ্র - ১৪১৯

স্বস্তিকা

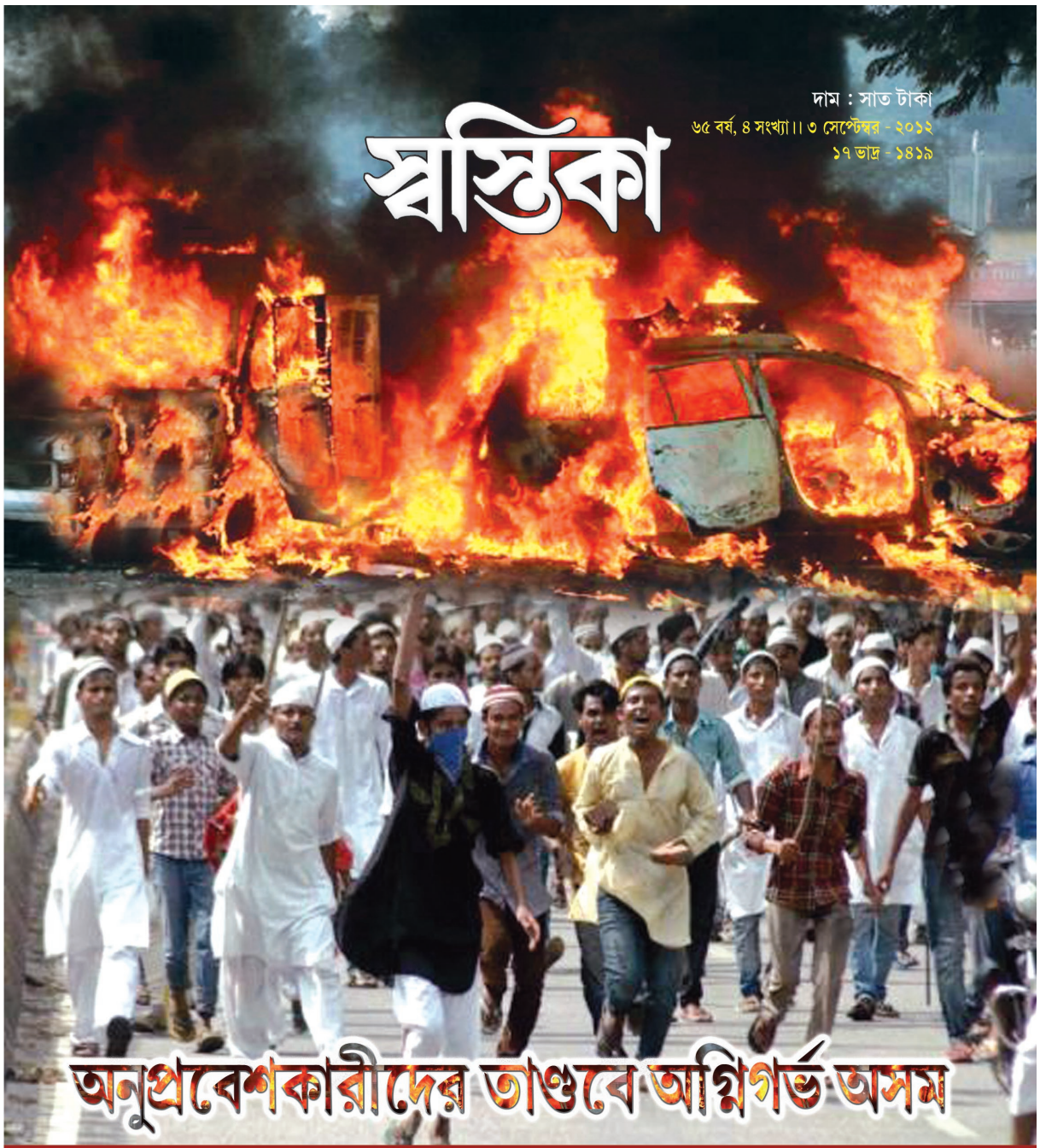

অনুপ্রবেশকারীদের তাণ্ডবে অগ্নিগর্ভ অসম

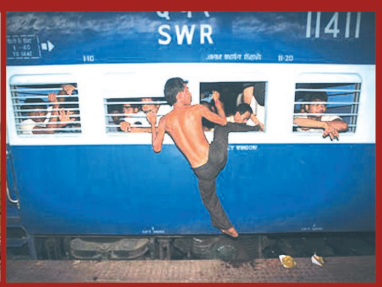

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

সি পি এমের দলতন্ত্রের বদলে কি এখন
তৃণমূলের দলতন্ত্র হতে চলেছে? ▯ ৯

সি পি এমের সংগঠনে ধস নেমেছে ▯ ১০

পরিচিত অসমকে আর পাওয়া যাবে না ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ১১

বিশেষ সাক্ষাৎকার : বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত
করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে
ফেরৎ পাঠানো হোক— ভাইয়াজী যোশী ▯ ১৩

কাশ্মীরের পুনরাবৃত্তি কি বোড়োল্যান্ডে দেখব? ▯ তরুণ বিজয় ▯ ১৫

কোকরাঝাড়ের জাতিদাঙ্গা : হিন্দুদের একত্রিত
হওয়া একান্ত প্রয়োজন ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৭

অসম সমস্যা সমাধানে সুপ্রিম কোর্টের
নির্দেশ অমান্য করে দেশকে বিপন্ন করেছে কংগ্রেস ▯ ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৯

তীর্থকথা শ্রীশৈলম ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২২

বঙ্গ-প্রতিভার আঁতুড়ঘরে এক সন্ন্যাসী ▯ অর্ণব নাগ ▯ ২৩

খোলা চিঠি : সিঙ্গুর ফল টক! ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ২৭

সি বি আইকে স্বাধীনভাবে শ্বাস ফেলতে দেওয়া হোক
▯ অরিন্দম চৌধুরী ▯ ২৮

গোত্রহীন আমলা থেকে কেলেঙ্কারি উদ্‌ঘাটনের পুরোধা
বিনোদ রাই ▯ ৩০

অখিলেশের রাজত্বে আড়াই মাসে পাঁচবার দাঙ্গা ▯ ৩১

মালদায় মা কালীর বেদী ভেঙ্গে ওয়াকফ বোর্ডের
অফিস নির্মাণের চেষ্টা ▯ ৩২

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২১ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯
সু-স্বাস্থ্য : ৩৫ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০
▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ পরিচিতি : অসমের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশ জুড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিভিন্ন চিত্রের কোলাজ। মাঝের ছবিটি লক্ষ্ণৌ শহরে মারমুখী মুসলিম জনতার প্রতিবাদের একটি দৃশ্য।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

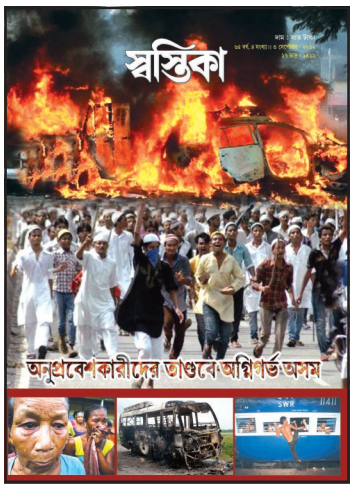

অগ্নিগর্ভ অসম

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৩ সেপ্টেম্বর - ২০১২

ফঃ ১

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। আগামী ৯ আগষ্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ **Swastika** - এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মানিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

দুর্নীতিগ্রস্ত ইউ পি এ সরকার কি পতনের পথে ?

একের পর এক সরকারি দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, পরিবারতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থ ইউ পি এ-২ সরকারকে আজ পতনের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেই ইউ পি এ সরকারের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন **ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, অমলেশ মিশ্র** প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অমানবিক নির্মমতা ও সেবার অধিকার

পশ্চিম ভারতের পুনা, মুম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতের কেরল, বাঙ্গালোর, চেন্নাই, হায়দরাবাদ প্রভৃতি শহর হইতে আগস্টের মাঝামাঝি কয়েকদিন ধরিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার নরনারী প্রাণ বাঁচাইতে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের একমাত্র অপরাধ তাঁহারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মূল অধিবাসী এবং হিন্দু। ওইসব প্রদেশের রাজ্য সরকার এবং মহাশক্তিশালী কেন্দ্র সরকার এবং তাহার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল সিন্ধে এবং ইউপিএ চেয়ারপার্সন তথা অন্তরাত্মা সোনিয়া ম্যাডাম উত্তর-পূর্বাঞ্চলগামী জনজাতি সমাজকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। কোকরাঝাড় এবং মায়ানমারের জাতিদাঙ্গায় মুসলমান সমাজ নাকি দারুণ 'মার' খাইয়াছে। তাহারই বদলার মহড়া মুম্বাই-এর আজাদ ময়দানের সমাবেশে দেখা গিয়াছিল। কেবলমাত্র মুসলমান সমাবেশ-এ হিন্দু নিরাপত্তারক্ষী (বিশেষত মহিলা পুলিশ) ও বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ওবি ভ্যান (ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট) ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা মিটাইয়াছে— এরূপ তথ্যই ওয়াকিবহাল মহল অবগত।

কোকরাঝাড় জেলার মূল অধিবাসীরা বড়ো জনজাতি। তাই মঙ্গোলিয়ান মুখাবয়বের অধিকারী সকল মানুষদের অবশিষ্ট ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে কৌশলে মোবাইল ফোনে এস এম এস মারফত ও চাপা কণ্ঠস্বরে বিশ আগস্টের মধ্যে সপরিবারে চাকুরী-ব্যবসা ছাড়িয়া পলায়ন না করিলে প্রাণহানির নিশ্চিত সম্ভাবনা— এই গুজব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে সম্প্রচার করা হইয়াছে। ইহা যে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সঙ্গত কারণেই তাই প্রশ্ন—কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্র, রাজ্য ও বিভিন্ন স্তরে যে গোয়েন্দা ব্যবস্থা রহিয়াছে তাঁহারা কি নাসিকায় তৈল দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন? বর্তমান প্রযুক্তিতে কোথা হইতে কোন্ সময়ে কোন্ কথা এস এম এস ও চলমান দূরভাষ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে ধরিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। রেলে আসন সংরক্ষণের কার্যালয়গুলিতে যখন উত্তরপূর্বাঞ্চলবাসীরা ভিড় করিতেছিলেন তখনও কি তাহা দর্শন করিতে পারেন নাই? পরিবর্তে উত্তরপূর্বের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের দায় এড়াইয়াছেন। অথচ ট্রেনে ওই বিপুল পরিমাণ যাত্রীদের জন্য খাদ্য পানীয়ের কোনওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এইসব ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় মানুষগুলির প্রতি রাজ্য সরকারগুলি ও কেন্দ্র কী নিদারুণ, নিস্পৃহ, নির্দয় ও নির্মমতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। মা-মাটি-মানুষের রেলমন্ত্রী ও সরকার কোথায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন? পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত হইতে দুই-তিনদিন রেলযাত্রা করিয়া অভুক্ত ক্রন্দনরত শিশুকোলে মাতার হাহাকার তাঁহাদের নির্দয় হৃদয়ে বিন্দুমাত্র বেদনা ও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে সমর্থ হয় নাই। একটি বাংলা দৈনিকে মা-মাটি-মানুষের বাংলায় হাওড়া স্টেশনে মর্মবিদারক দৃশ্যকে ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে যেভাবে হিন্দুরা প্রাণ বাঁচাইতে স্বাধীন ভারতে ফিরিতেছিলেন, সেদিনের সেই দৃশ্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। রেল-পুলিশকেও যখন এক ক্রন্দনরত শিশুর জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছিল তখন উত্তরে সে বলিয়াছে— "আপনি করুন, আমাদের কাজ নয়।" ইহাকে মানবতার চরম অপমান ছাড়া আর কি বলা যায়? এই খবর কর্ণগোচর হইবামাত্র রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সেবা ভারতী, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকেরা যখন পানীয় জল ও খাবারের প্যাকেট লইয়া উত্তরপূর্বের যাত্রীদের বিতরণ করিতে গিয়াছে তখনও তাহাদের নানা অজুহাত খাড়া করিয়া রেল পুলিশ ও প্রশাসন বাধা দিয়াছে। এইরূপ অপপ্রয়াসকে নিন্দা ও ধিক্কার জানাইবার ভাষা নাই। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মালদহ ও শিলিগুড়ি স্টেশনেও দেখা গিয়াছে। সেখানে 'ভারতমাতা কী জয়' বলা যাইবে না, খাঁকী হাফপ্যান্ট পরিধান করিয়া জল-দুধ-খাবার বিলি করা যাইবে না—এইরূপ নানা কথা বলিয়া বিভ্রান্ত ও বাধাদান করা হইয়াছে। বিষয়টি লইয়া হাওড়া, মালদহ ও শিলিগুড়ি স্টেশনে তর্কাতর্কি ও বিক্ষোভের উদ্রেক ধারণ করিয়াছিল। আশার কথা এই যে, শেষপর্যন্ত স্বয়ংসেবকরা অসহায় বিপর্যস্ত যাত্রীদের কাছে জল ও খাবার পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। উত্তরপূর্বাঞ্চল বাসীরাই কামরার ভিতর হইতে 'ভারতমাতা কী জয়' বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছেন। কতিপয় অফিসারও উপস্থিত দায়িত্বশীল কার্যকর্তাদের সাধুবাদ জানাইয়াছেন। সেবা করিবার অধিকার কোনও আইনেই কাড়িয়া লওয়া যায় না। রাজনৈতিক কারবারীরা ভোটের লোভে যতটা নীচে নামুনই না কেন, শেষপর্যন্ত শুভ বুদ্ধিরই জয় হইয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ওঠ, জাগো, সময় চলিয়া যাইতেছে, আর আমাদের সমুদয় শক্তি বৃথা বাক্যে ব্যয়িত হইতেছে। ওঠ, জাগো—সামান্য সামান্য বিষয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-মতান্তর লইয়া বৃথা বিবাদ পরিত্যাগ কর। তোমাদের সম্মুখে খুব বড় কাজ রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশঃ ডুবিতেছে, তাহাদের উদ্ধার কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সাম্প্রতিক সমীক্ষার মতে

এখন ভোট হলে ইউ পি এ-কে হটিয়ে দেবে এন ডি এ

সংবাদদাতা।। সংখ্যাতত্ত্ব ও ভোট ভবিষ্যতবাণীর বিশ্লেষক হিসেবে এ সি নিয়েলসন সংস্থা কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জন করেছে। তবে শেষ বিচার তো জনতা জনার্দনই করবে। তবুও ফলাফলের

বেশ কিছুটা আঁচ এই বিশ্লেষক সংস্থাগুলি আগাম পরিমাপের চেষ্টা করে। প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়া টুডে'র সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত সাম্প্রতিক সমীক্ষায়, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের অনিবার্য পতন ও বিরোধী এন ডি এ-র ক্ষমতাসীন হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলে দাবী করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা এর কারণ ও সরকারের জনপ্রিয়তারও একটা অনুমান নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সমীক্ষকদের মত অনুযায়ী ইউ পি এ-র তুলনায় ছোট জোট হলেও গত ৬ মাস ধরেই সর্বভারতীয় পরিসংখ্যানে এন ডি এ-র প্রাপ্য ভোটের অংশ প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপিএ-কে ক্রমাগত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এখানে খেয়াল রাখা দরকার, অন্তিম সমীক্ষা (আগস্ট ২০১২) অনুযায়ী ইউপিএ-র ভোট ২০০৯-এর প্রাপ্ত ৩৫.৭ শতাংশ থেকে ৫.৪ শতাংশ কমে ৩০.৩ শতাংশে দাঁড়ালেও তারা এন ডি এ-র ২০০৯ সালে প্রাপ্ত ২৫.৭ শতাংশ থেকে বর্ধিত ২৭.৫ শতাংশের থেকে শতাংশের নিরিখে বেশি। কিন্তু কংগ্রেস সারা ভারত জুড়ে ভোট পাওয়ায় তাদের প্রাপ্ত ভোট অধিকাংশ সময়ই বেশি হয় যা প্রায়শই আসনে রূপান্তরিত হয় না। অন্যদিকে নির্দিষ্ট রাজ্যগুলিতে মুখোমুখি লড়াইয়ে অল্প শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি আসন বাড়িয়ে নেয় বিজেপি। গত ফেব্রুয়ারি মাসের সমীক্ষা অনুযায়ী এন ডি এ ১৫-২০টি আসনে ইউপিএ-কে পেছনে ফেলেছিল। কিন্তু বিগত ৬ মাসে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সিদ্ধান্তহীনতা, অবিরাম মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা তামাদি হয়ে যাওয়ায় এন ডি এ-র প্রাপ্য আসনের সংখ্যা সমীক্ষা অনুযায়ী সম্ভাব্য স্বাস্থ্যকর ১৯৫-২০৫-এ এসে ঠেকেছে। অন্যদিকে ইউপিএ-র ঝুলি কমতে কমতে সম্ভাব্য ১৭১-১৮১-তে। সমীক্ষায় ইউ পি এ এবং এন ডি এ-র এখনও পর্যন্ত বাইরে থাকা দলগুলির ভোট শতাংশ গতবারের প্রাপ্ত ৩৮.৬ থেকে ৪২.২-এ পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেমন নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে জয়ললিতার জনপ্রিয়তা এখনও তুঙ্গে থাকায় করুণানিধির পারিবারিক শাসনপ্রণালীতে জনতার আদৌ সায় নেই। ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে ডি এম কে যে গাড্ডায় পড়েছে 'থালাইভর' করুণার তা থেকে বেরোবার রাস্তা এখনও অজানা। পরিণতিতে শরিক কংগ্রেসের ঝুলি থেকেও বেরিয়ে গেছে ১৬ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে অন্ধ্রে রাজশেখর রেড্ডীর পুত্র জগনমোহন রেড্ডীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আনা সংগতিহীন সম্পত্তির মামলাগুলিকে সেখানকার শতকরা ৬৪ জন মানুষই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলেই মনে করছে। পরিণতিতে যে অন্ধ্রের তাবৎ আসন নিয়ে কংগ্রেস তার শক্তি ২০০৪, ২০০৯-এ নির্ণায়ক জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, সেই ২৮/৩৩ আসন থেকে নগণ্য ৯-এ নেমে আসার সম্ভাবনা প্রবল। হারানো আসনের সিংহভাগই যাবে ওয়াই এস আর কংগ্রেসের দিকে। কেন্দ্রে তিনি কার পক্ষে থাকবেন এটা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়।

সমীক্ষা মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গে মমতা ম্যাজিক অটুট থেকে কংগ্রেসকে বিশেষ কিছুই এককভাবে করতে দেবে না। বাকিটা ভবিষ্যৎ। তবে বিজেপি-র পক্ষে সবচেয়ে উজ্জীবিত হওয়ার মতো খবর পাওয়া যাচ্ছে হারানো উত্তপ্রদেশ থেকে। সমীক্ষা অনুযায়ী সেখানে মুলায়মের বংশানুক্রমিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ ইতিমধ্যেই অসন্তুষ্ট। গত বিধানসভায় অখিলেশের পক্ষে ভোট দেওয়া শতকরা ১৫ জন তাঁদের পচ্ছন্দ পাল্টে বিজেপি-র দিকে ঝুঁকেছেন। কংগ্রেসের মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ে তাদের থেকে ১১ শতাংশ ভোট বিজেপি-র দিকে যাচ্ছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করে সমীক্ষায় বলা হয়েছে নির্বাচকরা মনে করছেন কেন্দ্রে কংগ্রেসের ফেরা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মূলায়ম মায়াবতী কংগ্রেসের ধামাধরা ও সুবিধেবাদী হওয়ায় নিকম্মা থাকবে। সম্ভাব্য ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে তারা বিজেপি-কেই চিহ্নিত করে সদর্থক ভোট করতে চাইছেন।

রাজ্যওয়ারী হিসেব ধরে সমীক্ষায় কর্ণাটকে বিজেপি-র আত্মঘাতী রাজনীতির খেসারত হিসেবে ভোট শতাংশে ৯ শতাংশ কমে যাবে, পরিণতিতে আসনও কমবে। তবে রাজস্থানে অশোক গেলটের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে ভোট পড়ার ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। ভোট সুইং প্রায় ১৪ শতাংশ, পরিণামে গতবারের ৪টি থেকে বিজেপি-র আসন বেড়ে ১০-১৫ হওয়ার জায়গায়। সেখানে লড়াকু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের কাজকর্মের সদর্থক প্রতিক্রিয়া নির্বাচনে পড়বেই। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং-এর জনপ্রিয়তা এখন গগনচুম্বী। এই নীরব কর্মীর ভোট বাক্সে তুফান

তোলার সম্ভাবনা পড়বেই। গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর আসন সংখ্যা সমীক্ষার নিরিখে ০৯-এর ১৫ থেকে বেড়ে ২০-তে পৌঁছানর ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস ও এন সি পি-র ক্রমবর্ধমান খেয়েখেয়ি বিজেপি জোট-কে গতবারের ২০ থেকে ২৮টি আসনে এগোনোর ভবিষ্যৎবাণী করছে। সমগ্র চিত্রটি মিলিয়ে সমীক্ষকরা জানাচ্ছেন বিজেপি রাজ্যে রাজ্যে যে সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখে মানুষ আশাবাদী। এই দল একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো খাড়া করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে রয়েছে একাধিক সমর্থ ও দায়িত্বশীল নেতা। এই প্রসঙ্গে তাঁরা দেশের ১৯টি বড় রাজ্যে ১২৫টি লোকসভা কেন্দ্রের আওতাধীন ১৫৮২৭ জন ভোটারের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতেই সমীক্ষাটি চালান। জনপ্রিয়তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিরিখে সমীক্ষা জানাচ্ছে— (১) প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীকে চান সবচেয়ে বেশি ২১ শতাংশ মানুষ, অর্ধেকেরও কম শতকরা ১০ জন রাহুল গান্ধীকে, ৮ জন আদবানীকে।

(২) জনতার শতকরা ৫৫ জন বিশ্বাস করেন বিজেপি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। (৩) শতকরা ৫৪ জন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

(৪) একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে সমীক্ষা বলছে কংগ্রেসের সম্পাদক রাহুল গান্ধী বরাবর 'ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস' প্রথায় রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর কাজ চলেছে যা কোনওদিনই শেষ হওয়ার নয়। আসলে তিনি দায়িত্ব না নিয়ে বিপুল ক্ষমতা ভোগ করতে চান আর পরিবারতন্ত্রের ছায়ায় তা তিনি পেয়েই চলেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁর গর্ভধারিণীরও একই পছন্দ। তিনি অন্তরাত্মা হয়ে বসে থাকাই অনেক নিরাপদ বোধ করেন। অবিমিশ্র ক্ষমতাভোগে তাতে কোনও বাধা নেই। সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মানুষ আর মোটেই তার সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের ক্ষমতা বা সদিচ্ছা আছে বলে মনে করে না। এ সবই ঘনায়মান সংকট ও বিদায়ী লক্ষণ। তাই সমীক্ষা অনুযায়ী এই মুহূর্তের রাজনৈতিক পটভূমিতে নির্বাচন হলে ইউ পি এ-২ কে পাততাড়ি গোটাতে হবে।

সংখ্যালঘু কমিশনের রিপোর্ট পক্ষপাতমূলক

মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমে বড়ো ও বাংলাদেশী মুসলিমদের সাম্প্রতিক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিস (এন সি এম) যে রিপোর্ট পেশ করেছে তার তীব্র নিন্দা করেছে দি এশিয়ান সেন্টার ফর হিউমান রাইটস (এ সি এইচ আর)। তাদের অভিযোগ— এন সি এম একতরফাভাবে বোড়ো সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেছে। হিউম্যান রাইটস কমিটি বলেছে, এন সি এম অসমের হিংসাদীর্ণ জেলাগুলি ঘুরে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে মুসলিমদের সংখ্যালঘু ও বড়োদের সংখ্যাগুরু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সি এইচ আর-এর ডিরেক্টর সুহাস চাকমা বলেছেন, এটা স্পষ্টতই ন্যাশনাল কমিশন অফ মাইনরিটিস অ্যাক্ট— ১৯৯২-কে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কেননা বোড়োদের ১৫ শতাংশ যেখানে খৃস্টান এবং ৫০ শতাংশ নিজেদের প্রকৃতির পূজারী **(Animist)** —'বাথু' **(Bathu)** বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, তারা এন সি এম আইন অনুযায়ী সংখ্যালঘু। তিনি আরও বলেছেন, তারা ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর অফিসকে এই রিপোর্ট বাতিল করতে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। হিংসাদীর্ণ এলাকার লোকেরা ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউলড ট্রাইবস (এন সি এস টি)-কে তাদের এলাকা পরিদর্শন করার দাবী জানিয়েছে। বোড়োসহ তপশিলীভুক্ত লোকেদের অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, সেইজন্যই এই দাবী। এন সি এম কোকড়াঝাড় শহরের বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে বোড়ো শরণার্থীদের শিবিরটিতে শুধু গেছেন। অন্যদিকে তারা ৬টি মুসলিম ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন। এই দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এন সি এম রিপোর্টে বলেছে, বোড়োরাই নিজেদের ঘরদোর লুঠপাঠ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এন সি এমের পুরো রিপোর্টই পক্ষপাতিত্বমূলক বলে হিউম্যান রাইটস-এর অভিযোগ।

মাওবাদীদের অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর কলকাতায় ধৃত মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী (এন আই এ) চার্জশীট দাখিল করে তাদের রকেট লঞ্চার সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির গবেষণা সংক্রান্ত সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর প্রকাশ করে দিয়েছে। এন আই এ এই সূত্রে সাদুলা রামকৃষ্ণ ওরফে সাদনালা রামকৃষ্ণণ (৬৪)-এর নামোল্লেখ করে জানিয়েছে, সে মাওবাদীদের টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট কমিটির প্রধান পাণ্ডা। মাওবাদীদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পেছনে মূল মাথা। রামকৃষ্ণণ মূলত অন্ধ্রপ্রদেশের করিমগঞ্জের বাসিন্দা। কলকাতা পুলিশের টাস্কফোর্স অন্ধ্র পুলিশের সহায়তায় গত ১ মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত অন্য মাওবাদীরা হলেন ছত্তিশগড়ের দীপককুমার, পশ্চিমবঙ্গের সুকুমার মণ্ডল, শম্ভুচরণ পাল ও বাপি মুদি। এদের বিরুদ্ধে কলকাতা সিটি সেশন কোর্টে এন আই এ চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে। মাওবাদীরা যে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয়— এই মর্মে এন আই এ-র পক্ষে এটাই প্রথম চার্জশীট দেওয়া হলো।

চাজশীটে এন আই এ বলেছে, এই তদন্তে কলকাতার কারখানা থেকে মুম্বাই হয়ে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অস্ত্রশস্ত্র ও মালমশলা যোগানের গোপন রাস্তাটির খোঁজখবর পাওয়া গেছে। রকেট লঞ্চার ও অন্যান্য অস্ত্রের কিছু ডায়াগ্রাম ও তৎসম্পর্কিত কাগজপত্র, বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর কিছু তথ্য এবং বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র যুক্ত করার যন্ত্রাংশ পাওয়া গেছে বলেও এন আই এ জানিয়েছে।

চার্জশীটে বলা হয়েছে, ১৯৯৪ সালে মাওবাদীদের এই শাখাটির নাম ছিল সিপিআই (এম এল) পি ডব্লিউ। এটাই ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে ২০১১-এর জুলাইতে সেন্টার টেকনিক্যাল কমিটি (সি টি সি) রূপে গঠিত হয়। সি টি সি রামকৃষ্ণণের তত্ত্বাবধানে পুণে, রৌরকেল্লা, ইন্দোর, ভূপাল ও ভুবনেশ্বরে টেকনিক্যাল ইউনিট গঠন করে। পুলিশ ২০০৭-এ ভূপাল ও রৌরকেল্লা থেকে কয়েকজন সিটিসি সদস্য গ্রেপ্তার করে। রামকৃষ্ণণ ও দীপক এই দুজনেই বিরাটির এ পি সি রোডের মৈনাক আবাসনের একটি ফ্ল্যাট কিনে থাকছিল বলে এন আই এ দাবী করেছে।

নিঃশর্ত সমর্পণের জন্যই সঙ্ঘকাজ বেড়ে চলেছে : শ্রী রঙ্গাহরি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''যেখানে 'সমর্পণ' সেখানে ভ্রষ্টাচার নেই আর যেখানে ভ্রষ্টাচার সেখানে কোনও সমর্পণ নেই। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নতম সদস্য থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমর্পণের মানসিকতা থাকলে দুর্নীতি থাকে না, সংগঠন সর্বত্র প্রসারিত হতে থাকে। একথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সঙ্ঘ সেজন্য পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত হয়েছে। ভারতের বাইরে বিভিন্ন নামে পঞ্চাশটি দেশে পাঁচশত শাখা চলছে। ভারতবর্ষেও সমাজজীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন সংগঠন পরিচালনা করছেন। দেশের মধ্যে তারা প্রথম স্থানেই রয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (বি এম এস), বিদ্যাভারতী-র উল্লেখ করা যায়।''

সমর্পণ অনুষ্ঠানের সভাপতি তরুণ গোস্বামী গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করছেন।

গত ২৬ আগস্ট সকাল দশটায় মহাজাতি সদন সভাগারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের শ্রীগুরুদক্ষিণা সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা তথা সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য শ্রীরঙ্গাহরি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গৈরিক পতাকাকেই গুরু হিসেবে গ্রহণ করেছে। রঙ্গাহরিজী আরও বলেন, একসময় কংগ্রেসের শীর্ষস্তরে সমর্পণ ছিল কিন্তু ক্যাডারদের মধ্যে ছিল না। শ্রী রঙ্গাহরি আরও বলেন, ভারতবর্ষে প্রায় একই সময়ে সঙ্ঘ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ শুরু রয়েছিল ১৯২৫ সালেই--- নাগপুর ও কানপুরে। সঙ্ঘের কিছুই ছিল না। ওদের সব ছিল। আজ পরিস্থিতি উল্টো। লালঝাণ্ডা খুব কম স্থানে দেখা যায়, গৈরিক পতাকা বিশ্বজুড়ে স্থান করে নিয়েছে। এদিনকার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী। শ্রী গোস্বামী তাঁর ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্ঘকাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ত্যাগ ও সেবাই এদেশের আদর্শ। সঙ্ঘ সেই আদর্শেরই অনুসরণ করছে। সভা পরিচালনা করেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ জয়ন্ত পাল। তিনি মঞ্চস্থ সকলের পরিচয় করিয়ে দেন। শেষে ধন্যবাদ দেন শক্তিশেখর দাস। এদিন প্রায় এক হাজার স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘ অনুরাগী গৈরিক ধ্বজকে পূজা করে গুরুদক্ষিণা সমর্পণ করেন।

'সমগ্র গঙ্গা' অভিযানের উদ্যোগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখ থেকে বিজেপি'র সর্বভারতীয় নেত্রী সাধ্বী উমা ভারতীর নেতৃত্বে গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত 'অবিরল নির্মল গঙ্গা' প্রবাহ বিষয়ে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনজাগরণ-এর উদ্দেশ্যে এক যাত্রা-অভিযান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কলকাতায় গত ২৫ আগস্ট এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়েছেন 'লোকভারতী' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংযোজক বীরেন্দ্র পাল সিং।

যাত্রা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে গঙ্গামাতার পূজার্চনা করে গঙ্গাসাগর থেকে শুরু হবে। যাত্রা শুরুর আগে ওইদিন সকাল সাড়ে এগারোটায় সাধ্বী উমা ভারতী কলকাতা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সাগরের উদ্দেশে রওনা হবেন। এই জনজাগরণ যাত্রায় তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। অরাজনৈতিক এই যাত্রাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সবরকম সহায়তা করা হবে বলে পরিষদ সূত্রে জানা গেছে। যাত্রাপথে ছোট ছোট আকারে জনসভা হবে। এলাকার জনসাধারণের উদ্দেশে শ্রীমতী উমা ভারতী বক্তব্য রাখবেন। এখানে উল্লেখ্য, টিহরী বাঁধ নির্মাণের সময় থেকেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অবিরল নির্মল গঙ্গা প্রবাহ-এর জন্য বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও জনজাগরণ করে আসছে। উমা ভারতীর এই যাত্রা সেই দাবী ও আন্দোলনকে আরও জোরদার করবে।

২১ সেপ্টেম্বর বিড়লাপুর ও কলকাতায় যাত্রাকে স্বাগত জানানো হবে এবং বড় জনসভা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কলকাতায়ও শ্রীমতী উমা ভারতী সন্ধ্যায় গঙ্গা-আরতি এবং সকালে গঙ্গাপূজা করবেন। ২২ তারিখ সকালে যাত্রা নবদ্বীপের উদ্দেশে রওনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ধুবুলিয়া, বহরমপুর, সূতি ও ফরাক্কায় জনসভা হবে। ফরাক্কা থেকে যাত্রা রাজমহল, পাকুড় হয়ে বিহারে রাজ্যে প্রবেশ করবে।

সিপিএমের দলতন্ত্রের বদলে কি এখন তৃণমূলের দলতন্ত্র হতে চলেছে?

গূঢ়পুরুষের

কলম

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার সরাসরি সাংবাদিকদের সঙ্গে লড়াইতে নেমেছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ যে সংবাদমাধ্যম ধর্ষণ ও নারী লাঞ্ছনায় প্ররোচনা দিচ্ছেন। কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের নবগঠিত যুব সংগঠন 'যুবা'-র প্রথম রাজ্য সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এখন কিছু সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল টাকা দিয়ে মহিলাদের ধর্ষণের অভিযোগ আনতে প্রলোভিত করছে। টাকা খরচ করে এখন টিভি চ্যানেল ব্রেকিং নিউজ তৈরি করছে। তোমাদের টাকা আছে বলে চ্যানেল করেছো। আর ব্যবসা বাড়াতে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করে চমকদারি খবর প্রচার করছো। মমতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, যে সব সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন তাদের ছাড়া হবে না। পুলিশ ষড়যন্ত্রকারী সাংবাদিকদের গ্রেফতার করবে। প্রসঙ্গত, মমতা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন কলকাতায় একটি ধর্ষণের ঘটনায় অভিযোগকারিণী যে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অভিযোগকারিণীকে নাকি সাংবাদিকরা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিয়েছিল।

যদিও মমতা নির্দিষ্টভাবে বলেননি যে ঘটনাটি কবে এবং কোথায় ঘটেছিল। তবে বোঝাই যাচ্ছে তিনি চেতলা এলাকায় ধর্ষণের অভিযোগকে চিহ্নিত করেছেন। এখানে এক মহিলা অভিযোগ করেছিলেন তাঁকে রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন যুবক গণধর্ষণ করে। মহিলা তাঁর অভিযোগে বলেছিলেন ধর্ষণকারীদের একজনকে তিনি চিনতে পারেন। তার নাম 'ছেনো'। সে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী। এরপর পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পায় যে তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াইতে তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়। পুলিশই সংবাদমাধ্যমকে জানায় যে এলাকার জনৈক তৃণমূল নেতার সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের তীব্র লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই গোষ্ঠী লড়াইতে বিধায়কের ডান হাত ছিল 'ছেনো'। তাকে সরাতেই মহিলাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর জন্য সেই তৃণমূল নেতা ১ লক্ষ টাকা খরচ করে। যার অর্ধেক অভিযোগকারিণীকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, গত সাত মাসে নারী লাঞ্ছনার যে সব ঘটনা থানায় রেকর্ড করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র এই একটি অভিযোগ অসত্য বলে জানা গেছে। অন্তত পুলিশ এমনটাই দাবি করেছে। মমতা বলেছেন, তাঁর সরকারের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তাঁকে এই তথ্য দিয়েছেন। তা' হতেই পারে। কারণ, দলীয় স্তরে তদন্তের দায়িত্ব মমতাই ফিরহাদ হাকিমকে দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্টও তিনি দলের নেত্রীকে দিয়েছেন। রিপোর্টে এলাকার জনৈকা মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলারের স্বামীকেই অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফিরহাদ হাকিমের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মমতার নির্দেশে অভিযুক্ত ছেনোকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশের তদন্ত রিপোর্টে এবং দলীয় তদন্তে কোথাও বলা হয়নি যে সংবাদমাধ্যম টাকা খরচ করে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছে। বরং রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠরাই টেলিফোন করে দুটি বড় টিভি সংবাদ চ্যানেলকে ধর্ষণের খবর দেয়। এরপরেও মমতা তাঁর দলের অপরাধীদের ধোয়া তুলসী পাতা বলে গলাবাজি করছেন। সাংবাদিকদের ঘাড়েই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায় চাপিয়ে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দল আছে। ভৈরব বাহিনী আছে। পুলিশ প্রশাসন সবই তাঁর হাতে। তিনি বাংলার মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী। তিনি ইচ্ছা করলেই যে কোনও ব্যক্তিকে হাজতে পুরতে পারেন। যেমন, বেলপাহাড়িতে গরিব বর্গাদার কৃষককে মাওবাদী তকমা লাগিয়ে হাজতবাস করিয়েছেন। তাঁর অপরাধ তিনি জনসভায় নেত্রীর ডজন ডজন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ানোয় বাধা দিয়ে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন চাষের সার নিয়ে কালোবাজারি চলছে। সরকারের নির্দিষ্ট দামে চাষীরা সার পাচ্ছেন না। এতেই নেত্রী মেজাজ হারিয়ে গরিব চাষিকে মাওবাদী বলে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পরে জানা যায় যে সে নেত্রীর দলেরই একজন কর্মী। জেল হাজত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে সে এখন নিজের নাক কান মুলেছে। শুধু তিনি নন, তাঁর গ্রামের সকলেই এক সুরে বলেছে, ভবিষ্যতে তাঁরা নেত্রীর দলের ছায়াও মাড়াবেন না। রাজ্য থেকে সিপিএমকে তাড়ানোর খুবই দরকার ছিল। তাই রাজ্যের ভোটদাতারা মমতাকে সমর্থন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে সিপিএমের দলতন্ত্রের পরিবর্তন হয়ে এখন তৃণমূলের দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে সিপিএম তার ৩৫ বছরের শাসনে যা পারেনি তা' তৃণমূল নেত্রী মাত্র এক বছরে পেরেছেন। বিচার ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম এমনকী পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা কলঙ্কিত করতে এমন রক্তচক্ষু রাজ্যের দ্বিতীয় কোনও মুখ্যমন্ত্রী অতীতে পারেননি।

সিপিএম-এর নেতা ও দলদাসরা একদা সাংবাদিকদের গণশত্রু বলতেন। মহাকরণে ঐতিহাসিক প্রেস কর্ণার ভেঙে দিয়ে সাংবাদিকদের মহাকরণে প্রবেশ নিষিদ্ধও করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পরে আলিমুদ্দিনের নির্দেশে বুদ্ধদেববাবু তাঁর ভুল স্বীকার করে সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমাও চান। অনেক সময় রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে সিপিএমের দলদাসরা তির্যক মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা বিচারকদের 'অসাধু' বলার দুঃসাহস দেখাননি। মমতা দেখিয়েছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে তিনি ওই পদে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। সুতরাং কমিশনের প্রধান তাঁর নির্দেশ মেনে কাজ করবেন। কিন্তু তা হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপককে কার্টুনকাণ্ডে 'সুপারি কিলার' হিসাবে চিহ্নিত করে পুলিশ হেফাজতে চরম লাঞ্ছিত করা হয়। মানবাধিকার কমিশন দোষী দুই পুলিশ অফিসারকে নিজেদের উপার্জন থেকে মোট ১ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি পূরণের নির্দেশ দিয়েছে। এতেই নেত্রীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। অথচ তাঁরই দলের পক্ষ থেকে চাপ দিয়ে অধ্যাপক এবং তাঁর প্রতিবেশী প্রবীন বন্ধুকে গ্রেফতার করানো হয়। পুলিশকে চাপ দিয়ে অধ্যাপককে 'শিক্ষা' দেওয়ার কথা থানায় অভিযোগকারী স্থানীয় তৃণমূল ঠিকাদার নেতা পরে স্বীকারও করেন। নেত্রী দলের উটকো মস্তান নেতাদের কুকর্ম দেখেন না। বরং প্রশ্রয় দেন। সিপিএমও তার দলদাস হার্মাদদের ঠিক এইভাবেই প্রশ্রয় দিয়েছে। তার পরিণাম যে কী হয় সে কথা এখন আলিমুদ্দিনের একদা বাঘেরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সমাজবিরোধীদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেওয়ার বিষময় ফল তৃণমূল নেত্রীও পাবেন। হ্যাঁ, দায়িত্ব নিয়ে বলছি পাঁচ বছরের শাসনকালেই নেত্রী দেখবেন তাঁর দল জনসমর্থন হারিয়ে পুনরায় মুষিক হয়েছে। যেমন, আলিমুদ্দিনের ব্যাঘ্র গর্জন এখন মার্জারের মৃদু মিউ মিউ হয়েছে। দেওয়ালের লিখন বিমান-বুদ্ধরা পড়তে পারেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পড়তে পারছেন না। বাংলার মানুষ ঔদ্ধত্য, দম্ভ, ক্ষমতার নগ্ন অপব্যবহার সহ্য করে না। এইটাই দেওয়ালের লিখন।

সি পি এমের সংগঠনে ধস নেমেছে

নিশাকর সোম

সিপিএম পার্টির সাংগঠনিক অবস্থা শোচনীয়। এর সঙ্গে সঙ্গে পার্টি পরিচালিত গণসংগঠনগুলির অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। উত্তরবঙ্গে এস এফ আই-এর রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। ইতিমধ্যে যা সংবাদ বেরিয়েছে তাতে প্রকাশ পেয়েছে এস এফ আই-এর সদস্যসংখ্যা ৪ লক্ষ ৯০ হাজার কমে গেছে। এস এফ আই-এর সদস্যসংখ্যা কমার একটি কারণ হলো— অতীতে শাসনক্ষমতায় থেকে এস এফ আই রাজ্যের কলেজগুলিতে প্রায় সব ছাত্রকেই এস এফ আই-এর সদস্য হতে 'বাধ্য' করত। সাধারণ ছাত্ররা চুপচাপ 'চাঁদা' দিয়ে সদস্য হতেন। কলেজে ভর্তি হতে গেলে এস এফ আই-কে নজরানা দিতে হোত। এখন যেটা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ করছে বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে টাকা নেওয়ার জন্য কলেজের এলাকার পার্টি-এর লোকাল-কমিটির সম্পাদক সহ একাধিক সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কলকাতার এস এফ আই-এর সম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব বলেছেন— 'বছরের পর বছর এস এফ আই-এর ইউনিয়ন নির্বাচনে জেতাটা ভাল চোখে দেখেননি ছাত্ররা।'

গণসংগঠনে পার্টির সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই গণসংগঠনগুলি 'গণ-চরিত্র' হারিয়ে ফেলে পার্টির ডিপার্টমেন্টাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আগে কমিউনিস্টরা গণসংগঠন থেকে পার্টিতে কর্মী আনতেন। এখন পার্টি থেকে গণসংগঠনে কর্মী রপ্তানি করা হয়। পার্টির সদস্যরাই গণসংগঠনের নেতা হন। ফলে সাধারণ-কর্মীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। সিপিএমের 'বিপ্লবী' 'বিদ্রোহী' রেজ্জাক মোল্লা হাজি হবার জন্য হজ-এ যাচ্ছেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর এক বন্ধু একটি ট্রাভেল কোম্পানির মারফৎ হজ-এ যাচ্ছেন। তিনি যে খাঁটি মুসলমান সেটা প্রমাণ করার জন্যই কি হজযাত্রা?

এদিকে হুগলীর বহিষ্কৃত নেতা অনিল বসু এখন একক বিচ্ছিন্ন। কিছু দৈনিক সংবাদপত্রে অনিলবাবুর 'বিদ্রোহী অভ্যুত্থান'-এর 'গল্প' প্রচার করেছিল। কিন্তু ফানুস চুপসে গেছে। কারণ অনিল বসুকে শুধু পার্টির একাংশই নয়, হুগলীর কয়েকটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ 'ত্রাস-সন্ত্রাস'-এর হোতা বলে জানেন। এহেন লোক বিকল্প সংগঠন গড়বেন কি করে?

সিপিএমের ডাকা বিভিন্ন সভার জন্য

পুলিশ প্রশাসন অনুমতি না দিয়ে সিপিএম-কে প্রকারান্তরে 'হিরো' বানানো হচ্ছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে তৃণমূল সরকার। সিঙুর সম্পর্কিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট-হাইকোর্টের অর্ডার-এ স্থগিতাদেশ দেওয়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'সিঙুর আইন বৈধ'। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান বলেছেন— 'মুখ্যমন্ত্রী আইনজীবী। আমি সাধারণ বুদ্ধিতে বলছি মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি ভুল প্রচার করছেন।'

তিনটি জেলা পরিষদ ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে বামপন্থীদের প্রতিবাদের দরুণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।' এর জবাবে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি বলেছেন, 'বাম আমলেও চারটি জেলা পরিষদ ভাঙা হয়েছিল।' সুব্রতবাবুরা কি ৩৪ বছরের ঘৃণ্য বাম-রাজনীতির পথেই হাঁটতে চাইছেন? যে নীতিকে রাজ্যের মানুষ অপসারণ করে দিয়েছেন। অটো নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অটোচালকরা তো ঔদ্ধত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ ঘটনার পরাজিত পরিবহনমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর আমলেই ঔদ্ধত্যের বীজ বপন করা হয়েছিল। অটোর মিটার তুলে দেওয়া এবং বেশি যাত্রী তোলার ব্যবস্থা শ্যামলবাবুর আমলেই চালু হয়েছিল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি অটোচালকগণ শ্যামলবাবুকে পরিত্যাগ করে সবুজ রঙে নিজেদের রাঙিয়ে নিয়ে রাজ্য-জয়ের আচরণ করছেন।

সম্প্রতি বিধানসভার এক অনুষ্ঠানে জনৈকা গায়িকার চটুলগানে বিধানসভা মুখরিত হয়েছে। এই গায়িকা-কে একসময় বামফ্রন্টের তদানীন্তন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী সমালোচনা করেছিলেন। রাজ্যে কি রবীন্দ্র সংস্কৃতি বাতিল হয়ে 'নবসংস্কৃতি'র ঊষাকাল দেখা দিল?

সংশোধনী

(১) স্বস্তিকা ২০ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠায় 'ক্রীড়াভারতীর প্রথম দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন' শীর্ষক সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ খো খো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দিলীপ রায়-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যটি সঠিক নয়।

(২) স্বস্তিকা ২৭ আগস্ট, ২০১২ সংখ্যায় ১৭ পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ, 'আমার বাবা ছিলেন সকলের মাস্টারমশাই', এতে 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' মহাকাব্যের রচয়িতা হিসেবে কবি দীনেশচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাকাব্যের রচয়িতা কবি নবীনচন্দ্র সেন।

(৩) ওই সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'-র পৃষ্ঠায় 'দক্ষিণ ২৪ পরগণায় স্বাধীনতা দিবসেই জাতীয় পতাকা লাঞ্ছিত' শীর্ষক সংবাদে অকুস্থলের নাম আমতলার পরিবর্তে জামতলা এবং যে থানায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় তার নাম কুলটি-র পরিবর্তে কুলতলি হবে।

উপরোক্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

— সম্পাদক, স্বস্তিকা

পরিচিত অসমকে আর পাওয়া যাবে না

স্বপন দাশগুপ্ত

নিজেকে একজন বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষ ধরে নিয়ে যদি আমি কয়েকদিন আগের লোকসভায় মুলতুবী প্রস্তাবের ওপর বিতর্কটি শুনতাম তাহলে, বলতে দ্বিধা নেই, আমার মনে হোত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোকরাঝাড়ে ঘটে যাওয়া জাতিদাঙ্গার সম্পর্কে কোনও সম্যক ধারণা নেই, আর না হলে এ নিয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথা-ব্যথা নেই। তাই মনে হয়, আমার খুব একটা ভুল হবে না যদি আমি এমন সিদ্ধান্তে আসি যে আমাদের চলতি সৌজন্যমূলক গণতান্ত্রিক রাজনীতি বোড়োদের নিজের রাজ্যের তথাকথিত 'বোড়ো বাসভূমিতেই' প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার হাত থেকে কোনও ভাবেই বাঁচাতে পারবে না।

হ্যাঁ, বলতেই পারেন এগুলি অন্তর্ঘাতমূলক কথাবার্তা। তাই আমি অবশ্যই আশা করব আগামী বছরগুলিতে আমার ধারণা যেন সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রমাণিত হয়। কিন্তু, চলতি জোট সরকার ও বিরোধীপক্ষে থাকা তাদের বন্ধুরা যেভাবে বোড়োদের ক্ষোভকে সমূলে অস্বীকার করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু দুষ্পাচ্য ঘরোয়া তথ্যই সত্য হয়ে উঠছে।

ইতিহাস শতাব্দী অতিক্রান্ত :

১৯০০ সাল থেকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গীয় অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অসমের যে উপনিবেশীকরণ শুরু হয়েছিল আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাচ্ছে, যে সেই প্রক্রিয়া একটি সম্পূর্ণ ও নিরঙ্কুশ জয় লাভের দোরগোড়ায়। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর একনিষ্ঠ তাঁবেদার ও তাঁর খুব কাছের করিতকর্মা লোক হিসেবে মইনুল হক চৌধুরী, ফকরুদ্দিন আলি আমেদ বা দেবকান্ত বড়ুয়া নামের সেই ভাঁড়টি; যাঁরা অপার উন্নাসিকতায় এই অনুপ্রবেশকারীদের কংগ্রেসী ভোটবন্দী করে রেখেছিলেন, সেই বেআইনি পরিচয়হীনরাই আজ তাদের নিজেদের ঘুঁটি তৈরি করে

অসমে অনুপ্রবেশকারী আক্রান্ত।

ফেলেছে। রাজনীতির দাবায় তারা তথাকথিত মূল স্রোতের ধর্মনিরপেক্ষী দলগুলির মদত ঠিকই পেয়ে চলেছে। কিন্তু তাদের নেতাদের মধ্যে যারা বেশি বুদ্ধিমান বা বিশেষ মতে এ আই ইউ ডি এফ প্রধান ধুবড়ী থেকে নির্বাচিত লোকসভা সদস্য ধৃত বদরুদ্দিন আজমল খুব ভালভাবেই জানেন অসমের আলি, কুলি, বেঙ্গলী (মুসলিম, বিহারী বা অন্য প্রদেশের বাঙ্গালী) জোটে তাঁরাই আজ নির্ণায়ক জায়গায় পৌঁছে গেছেন।

শাসনের সময় :

গ্রাস করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে হয়তো আর একটি দশক লাগবে। তবে খবরাখবর যারা রাখেন, তথ্য ঘাঁটলেই দেখতে পাবেন অসমের ২৭টি জেলার মধ্যে ১১ থেকে ১৩টি জেলা ইতিমধ্যেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছে গেছে। গণভিত্তির এই পাহাড়প্রমাণ পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ফলশ্রুতি যে অচিরেই দেখতে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই প্রত্যাশিতভাবেই লোকসভায় সাম্প্রতিক উদ্বাস্তু শিবিরগুলির বাসিন্দাদের জাতিগত পরিচয় নিয়ে শরদ যাদবের নির্দিষ্ট ও জরুরী প্রশ্নটির জবাব সরকার এড়িয়ে গেছে। বাস্তবে আজকের অসমে জনসংখ্যার জাতিগত পরিবর্তন একটা সমস্যার চেহারা নিয়েছে যা অসম বা বাকি ভারতবর্ষ কেউই সঠিকভাবে বুঝতে চাইছে না। যে সমস্ত দল বোড়োদের সমর্থনে কথা বলছে তারা সেই ১৯৮৫ সালে সই হওয়া অসম চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের পরে ঢোকা সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তকরণ, ভোটাধিকারকরণ ও সবশেষে প্রত্যাবর্তনের গল্পই বলছে। তারা বুঝতেই চাইছে না এইসব দাবী তামাদি হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট করা 'কাট অফ' তারিখের পর ৪১ বছর গড়িয়ে গেছে। গণভিত্তিতে আমূল পরিবর্তন আজ যে কোনও সরকারি প্রশাসনের পক্ষেই নাগরিকত্ব সনাক্তকরণ অসম্ভব করে তুলেছে। এমনকি বিগত ৯০ দশকের শেষ দিকে তৎকালীন রাজ্যপালের প্রস্তাবিত নাগরিক পঞ্জীকরণ প্রক্রিয়াও এখন অকেজো হয়ে যাবে। জনগণনাকারীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এক বিপুল বিষম অনুপাতের (Disproportionate) মানুষজন গণনাকারীদের বলেছে তাদের সকলেরই

পাক পতাকা হাতেই অসমে বিক্ষোভ সমাবেশ মুসলমানদের।

জন্মস্থান ভারত।

আজমলের হিসেব ও সাফল্য :

আজমলের মতো নেতারা খুব ভালভাবেই জানেন সনাক্তকরণ ও প্রত্যর্পণের হুঙ্কারগুলি ফাঁপা। এই কারণেই আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে তাদের যে শক্তি সঞ্চিত রয়েছে সেখানকার মূলবসবাসকারীদের বিরুদ্ধে তাদের এখন সক্রিয় হতে বলছে না। সে খুব ভাল জানে যদি কোকরাঝাড়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় আর 'বোড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের' অবলুপ্তি ঘটে— 'নামনি অসম' ধরে গোটা বরাক উপত্যকার দখল নেওয়াটা তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজমলের পরিকল্পনার আর একটি দিক নজর দেওয়ার মতো। বলতে গেলে বাহবাই দিতে হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের স্থানীয় সমস্যাটিকে অদ্ভুত চাতুরীর সঙ্গে সে সর্বভারতীয় মুসলিম সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস পরিচালিত ও সর্বকালীন শক্তিহীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই নিয়ে মোকাবিলায় এই ধরনের কৌশলে সে সহজেই লাল চোখ দেখিয়ে সুবিধে আদায় করে নিচ্ছে।

মুসলিম রাজনীতি :

এই সম্পর্কিত লোকসভা বিতর্কে জোরালো সওয়াল করলেন হায়দরাবাদ থেকে নির্বাচিত এম আই এম প্রতিনিধি আসাউদ্দিন ওবৈসি। আশ্চর্য সওয়াল! তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাঙালাদেশ থেকে ক্রমাগত হিন্দু অনুপ্রবেশের ধাক্কায় অসমের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। এরই পরিণতিতে স্থানীয় মুসলিমদের বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে যদি না সরকার যথাযথভাবে তার নিরসন করে।

না, ওবৈসি একা নয়, আমরা অনেকেই খবর রাখি না। জুলাই দাঙ্গার পর দল নির্বিশেষে অত্যন্ত সংগঠিত ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত মুসলিম রাজনীতিবিদ মুসলিম শরণার্থী শিবিরবাসীদের সঙ্গে সংহতি দেখাতে সেখানে সরেজমিনে ঘুরে এসেছেন। এই সংক্রান্ত খবরাখবর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই খবরের শিরোনামে আসেনি। বা আসতে দেওয়া হয়নি। এই দলের পাণ্ডারাই কংগ্রেস হাইকম্যান্ডকে মুখ্যমন্ত্রী গগৈ এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে হুমকি দিয়ে এসেছে। এর পেছনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম তোষণের আরও একটি কৌশল ছিল। যার ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি ঘোষণা করে দেন দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত মুসলিমদের এখানে সাদরে বরণ করে নেওয়া হবে। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৌগত রায় আরও একধাপ এগিয়ে লোকসভায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কেই চ্যালেঞ্জ করে বলেন তাঁর দল বেআইনী অনুপ্রবেশকারী সনাক্তকরণ সংক্রান্ত মহামান্য আদালতের রায়ের সঙ্গে সহমত নয়। এই মুহূর্তে মুসলিম রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সরলরৈখিক নয়। যে সমস্ত রাজ্যে তারা সংখ্যালঘু সেখানে মূল স্রোতের দলগুলির সঙ্গে বিশেষত কংগ্রেসের সঙ্গে চলার কৌশল গৃহীত হয়েছে। অন্যদিকে সংখ্যাগত ভাবে যে যে অঞ্চলে বা রাজ্যে তারা এগিয়ে গেছে যেমন— মালাবারে মুসলিম লীগ, হায়দ্রাবাদে এম আই এম, অসমে এ আই ডি ইউ এফ, উত্তরপ্রদেশের অংশ বিশেষে পীস পার্টিকে জোরদার করার কাজ চলছে। আশঙ্কাজনকভাবে যদি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে এই প্রবণতা মাথাচাড়া দেয় বা এই কৌশল অবলম্বন করা হয় তাহলে জাতীয় রাজনীতির অভিমুখে এক বিশাল পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করব। কংগ্রেস পৃথক মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ম-জড়িত বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই হয়তো জীবন-জীবিকা রক্ষায় বোড়োদের কাতর আবেদন বধির কংগ্রেসী কর্ণকুহরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। তাই এটা নিশ্চিত করে বলা যায় জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম কৌশল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তার নির্দিষ্ট অস্ত্রটি প্রয়োগ করেছে। এবং তা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থের হানি সাধন করবে। তাই আক্ষেপ সেই অসম আর ফিরে আসবে না। □

(লেখক একজন বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

"সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়"

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বামী সিদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল
৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হোক : ভাইয়াজী যোশী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সমস্যার সমাধানে বেশ কিছুদিন যাবৎ 'ডিটেক্ট-ডিলিট-ডিপোর্ট'-এর সূত্র পেশ করে আসছে। যার অর্থ হলো, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের (এর অধিকাংশই অসমসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং এরাজ্যের মালদা-মুর্শিদাবাদের মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে রয়েছে) চিহ্নিতকরণ (ডিটেক্ট)। চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা ও রেশনকার্ড, স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি থেকে তাদের নাম বাতিল (ডিলিট) করা, নইলে এগুলিই তাদের ভারতীয় নাগরিক বলে প্রতিপন্ন করছে এবং করবেও। এরপরে এদের বিতাড়ন-ই (ডিপোর্ট) একমাত্র কর্তব্য, যাতে আর কোনওদিন তারা ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। দিল্লীর সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার'- এর বরিষ্ঠ প্রতিনিধি প্রমোদ কুমারের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক) শ্রী ভাইয়াজী (সুরেশ) যোশী অনুপ্রবেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, শুধুমাত্র নিরাপত্তাক্ষেত্রেই নয়, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও এটা অশনি-সংকেত বহন করছে। সাম্প্রতিক অসম-দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরছাড়া হওয়া এবং অসংখ্য জীবনহানির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সংঘর্ষের মূলোচ্ছেদ অর্থাৎ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন না করলে সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে। এই সাক্ষাৎকারের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হলো।

□ অসমে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

□ অসমের পরিস্থিতি সত্যিই খুব জটিল। এই সংঘর্ষের মুখ্য কারণ হলো বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশ। গোটা কোকরাঝাড় অঞ্চলে, যেখানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে এধরনের অনুপ্রবেশকারীরা বিশাল সংখ্যায় রয়েছে। সেখানে জমি দখলের জন্য প্রতিনিয়ত আক্রমণ চালাচ্ছে তারা। এর ফলে আমাদের দেশের মানুষ অনুভব করছেন তাঁরা তাঁদের নিজভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন, অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারীরা সেই বড় আকারের জমিতে থাবা বসানোর কাজে নিযুক্ত রয়েছে। একে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু কিংবা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার দৃষ্টিতে দেখলে ভুল করা হবে। আসল সত্য হলো যে এটা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বনাম প্রকৃত অধিবাসীদের লড়াই। বোড়ো বনবাসীরা এব্যাপারে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। সেই থেকে বিষয়টি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে না, যা তাদের করা উচিৎ ছিল। আমরা অনুভব করছি শুধুমাত্র কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী বিলি করলেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আসবে না। প্রয়োজন সমস্যার মূলোৎপাটন করা। আর সেই সমস্যা যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

□ আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে, যতদিন না অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে ততদিন এই সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে?

□ অবশ্যই। এটাই এর একমাত্র সমাধান। প্রত্যেক সার্বভৌম দেশের অধিকার রয়েছে যে তার ভূমিতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করা সমস্ত অভিবাসীদের বিতাড়ন করার। যদি সরকার ইচ্ছে করে যে কিছু বিদেশীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে তবে এই বিষয়টা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে সেই বিদেশীরা এদেশের নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট সাংবিধানিক অধিকারের সুযোগ অন্যায়ভাবে না নিতে পারেন। যদি অনুপ্রবেশকারীরা তাদের নাম ভোটদাতাদের তালিকায় তোলে, রেশন কার্ড এবং অন্যান্য নথি হাতে পেয়ে যায় যার দ্বারা এদেশের নাগরিক বলে সে প্রতিপন্ন হতে পারে, তবে তা কোনওমতেই সহ্য করা হবে না। একই সঙ্গে এটা জনসংখ্যার ভারসাম্যও বিঘ্নিত করছে।

□ কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা এক শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতিকদের প্রত্যক্ষ মদতে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধে পেয়ে আসছে। দ্বিতীয়ত, এধরনের অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

□ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ, ভোটার তালিকা ইত্যাদি থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং তাদের বিতাড়নের জন্য সরকার

কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। এখন ভীষণভাবে প্রয়োজন অনুপ্রবেশকারীদের নামগুলো খুঁজে বের করা। তারপর সমস্তরকমের নথি থেকে সেই নামগুলো খারিজ করা। এরপর সেই স্তরে নিয়ে গিয়ে কার্যকরীভাবে তাদের বিতাড়ন করা যাতে তারা আর কোনওমতেই যেন এদেশে ফিরতে না পারে। এইসব ক্ষেত্রে যদি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে কাজ না হয় তবে এই সমস্যা মিটবে না। এই ধরনের মানুষজনকে (অনুপ্রবেশকারীদের) দেশের মধ্যে নিজেদের সীমা লঙ্ঘন করতে দেওয়া উচিত নয়। ভারতকে এই ক্ষেত্রে নিপুণ এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দার কথা মাথায় রেখে কোনও নীতিগ্রহণ করলে তা দেশের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক হয় না।

■ **একটা রিপোর্ট এসেছে যে সারা দেশে অনুষ্ঠিত এই বছরের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে অর্থাৎ শিবিরে যুবকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব ভাল সংখ্যায়।**

■ হ্যাঁ, এটা একদম সত্যি কথা। শেষ কয়েক বছরে সমস্ত প্রান্তে (সঙ্ঘের প্রদেশ) শাখার সংখ্যা-বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এতে উৎসাহব্যাঞ্জক ফল হয়েছে। সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে যুবকদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত বেশি থাকার অন্যতম কারণ এটাই। শুধুমাত্র যুবকদের সংখ্যাই নয়, কর্মরত এবং প্রৌঢ় স্বয়ংসেবকদের সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। আমাদের প্রত্যাশার থেকেও এটা বেশি। কোনও কোনও সময়ে কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকসহ দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি থেকে কর্মরত স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা কম থাকতো শিক্ষা বর্গে। কিন্তু আমাদের কার্যকর্তাদের প্রচেষ্টার ফলে বর্গে এধরনের স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতি এবার বহুগুণ বেড়েছে। কলেজ ছাত্রদের জন্য পৃথক সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের আয়োজনও এক্ষেত্রে খুব কাজে দিয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের পেশাদারদের জন্য কর্ণাটকে এবছর একটি বিশেষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের আয়োজন করা হয়। ওই বর্গে প্রায় সত্তর জন তথ্য-প্রযুক্তি পেশাদার প্রশিক্ষণ নিতে উপস্থিত ছিলেন। একজন তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদারের কাছে ২০ দিন ব্যয় করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। কিন্তু তাঁরা ভাল সংখ্যায় এসেছিলেন এবং প্রত্যেকেই বর্গে ২০ দিন ছিলেন। আমরা চেষ্টা করছি অন্যান্য প্রান্তেও এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে কার্যকর করতে। সবমিলিয়ে ৭০টি সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ এবার দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন প্রায় ১৬,০০০ স্বয়ংসেবক। এদের মধ্যে প্রায় ১৪,০০০ জনই ছিলেন যুবক স্বয়ংসেবক। ■

কাশ্মীরের পুনরাবৃত্তি কি বোড়োল্যাণ্ডে দেখব?

তরুণ বিজয়

সেদিন স্থানীয় এক সার্কিট হাউসে বসে কথা হচ্ছিল বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সহকারী প্রধান শ্রী কম্পা বোড়োগোঁহাই-এর সঙ্গে। উনি বললেন, দিল্লী থেকে কেউ এখানে এসে বুঝবে না এখানকার স্থানীয় মানুষের বেদনা যারা অনবরত বিদেশী লুটেরা দ্বারা নিগৃহীত, অন্যান্য ভারতীয়ের মদতে নিজভূমি থেকে বিতাড়িতদের কথা।

তাঁর এই কথা অত্যুক্তি নয়, যথার্থ। সংক্ষেপে কোকড়াঝাড়ের হিংসা কিন্তু সেই তথ্যই বলছে যে, এদেশের মানুষই বিদেশীদের যোগসাজশে স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হতে সাহায্য করছে।

নির্লজ্জ ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিই হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার উন্মেষ ঘটাচ্ছে এবং নিজেদের ভূমিতেই এদেরকে ব্রাত্য করে তুলছে। গুয়াহাটি এবং দিল্লীর শাসকবর্গ হিন্দু এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীও হিন্দু, তবুও এদের কেউই এই অসহায় বোড়ো হিন্দুদের পাশে নেই। এরা ভাবছে বোড়োদের পাশে দাঁড়ালে পাছে তারা মুসলিমদের উষ্মার শিকার হয়। একজন বোড়ো নেতা যিনি ঘটনাচক্রে কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারের সমর্থক, সখেদে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশী মুসলিমরা কেন্দ্রে শক্তি সঞ্চয় করে বিধায়ক, সাংসদদের দিল্লীর নামী-দামী বাংলো থেকে উৎখাত করে ৩০ কিমি দূরে ছুঁড়ে ফেলছে ততক্ষণ এরা বুঝবে না নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার নরক যন্ত্রণা কী রকম দুঃসহ!

সরকারি হিসেব অনুসারে, বোড়ো অঞ্চলে হিংসার বলি ৬১ জন এবং সওয়া দু-লক্ষ হিন্দু নিজেদের দেশেই শরণার্থী। তাদের ঘর-বাড়ি পুড়েছে, লুট হয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করেছে বাংলাদেশী মুসলিমরা।

কোকড়াঝাড় একটি শান্ত মনোরম শহর। এই শহরটিকে বাছা হয়েছিল বোড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের রাজধানী হিসাবে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী এল কে আদবানীর সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত হবার পর। এই

উদ্বাস্তু শিবিরে বোড়ো মহিলারা।

বিটিসি অঞ্চল মূলতঃ চারটি জেলা যেমন কোকড়াঝাড়, বাক্সা, চিড়াং এবং উদলগিরি নিয়ে। এই অঞ্চলের ৪০টি বিষয় যেমন শিক্ষা, কৃষি, সড়ক, আদিবাসী উন্নয়ন ইত্যাদি এই কাউন্সিলের অধীন এবং পুলিশ দপ্তর অসম সরকারের অধীনস্থ।

বড়োদের অভিযোগ পুলিশ তাদের কথায় কর্ণপাত করে না। অধিকাংশ পুলিশকর্তা প্রায়শই তাদের সরকারি দায় পালন করে কেবল বাংলাদেশীদের সাহায্য করে। গত ২৩ জুলাই মুসলিমদের সূত্রে প্রাপ্ত-সংবাদের ওপর ভিত্তি করে জিজ্ঞাসাবাদের অছিলায় বোড়ো যুবকদের তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পরে তারা নিখোঁজ হয়ে যায় এবং গোঁসাই গাও-এ এক কূপে সন্ধান মেলে জয়সভ ব্রহ্ম নামে এক যুবকের ভাসমান মৃতদেহর। অপর এক যুবক সংসওরাং ব্রহ্ম আজও বেপাত্তা। অসম সরকার ফকির গ্রাম থানার এক কর্তা আবদুল রাজ্জাককে বরখাস্ত করে দায় সারে। আবদুল দোষী হলেও ওর সাক্‌রেদ দানেশ আলির বিরুদ্ধে কিছুই ব্যবস্থা নেয়নি সরকার।

২১ জুলাই পারোরা গ্রামে অল বোড়ো মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কর্মীরা দু'জন মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় অল বোড়োল্যান্ড মাইনরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের দুই সদস্য— সভাপতি মহিদুল ইসলাম এবং আবদুল সিদ্দিক শেখকে মাগুরমারিতে গুলিবিদ্ধ করা হয় কোকড়াঝাড় শহর থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে। পুরো সংঘর্ষ দুই মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখ করার মতো যে, এই মহিদুলের বিরুদ্ধে বে-আইনী অস্ত্রসংগ্রহের বহু মামলা ঝুলে রয়েছে।

তবুও সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কারণে তারা বোড়োদের ওপর দোষারোপ করে। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে চার বোড়ো যুবক প্রদীপ বোড়ো, ধ্রুবজীত গোয়ারী, যতীন গোয়ারী এবং জোয়ানসগর নামে এই চার বোড়ো যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পুলিশ খোলা ভ্যানে চড়িয়ে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে মুসলিম জনতা ভ্যান থামিয়ে কুপিয়ে খুন করলেও পুলিশ নীরব দর্শক। এতেই প্রমাণ মিলছে যে, কীভাবে সরকার বিদেশী চিহ্নিতকরণে এবং তাদের বিতাড়নে কতটা ব্যর্থ। স্বদেশপ্রেমী মানুষের হতাশা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছে যে, এডিটরস গিল্ডের প্রাক্তন সভাপতি এবং সেন্টিনাল পত্রিকায় মান্যবর সম্পাদক বললেন, ''তরুণ, তোমাদের মতো দিল্লিবাসীদের কাছে ভারতের শুরু

বৈষ্ণোদেবীতে আর শেষ কলকাতায়। তোমরা বুঝতে চাওনা উত্তর-পূর্ববাসীদের বেদনা আর জ্বালা"। এমনকী গুয়াহাটি উচ্চ আদালত ২০০৮ সালের ২৩ জুলাই রায়ে মেনে নিয়েছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই সরকার নিয়ন্ত্রক।

এইবারে কোকরাঝাড়ে উল্লিখিত দুই মুসলিম ছাত্র-সংগঠন শুরু থেকেই হিংসায় নিরাপত্তাহীনতাও।

গোপালগঞ্জ বাজারে আমসু কর্মী এবং দোকানদারদের মধ্যে সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ লাঠি চালায়। গৌরীপুরে আমসুর কর্মীরা ৩৫টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সঙ্গে বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের দপ্তরও।

কোকরাঝাড়ে দাঙ্গা-বিধ্বস্তদের মাঝে আদবানী।

ইন্ধন জুগিয়েছে। তবুও সরকার অন্ধ সেজে রয়েছিল। নিরপেক্ষ সংবাদসূত্র মতে, ''ধুবড়ি হলো জমি নিয়ে বোড়ো এবং অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের হিংসার উৎস কেন্দ্র। গত ৫ বছর যাবৎ নানাভাবে মুসলিমরা ধুবড়ী থেকে কোকড়াঝাড়ে ঢুকে উৎপাত শুরু করে দেয়।' সংবাদে প্রকাশ, 'কারফিউ জারি করা হয়। মুসলিমরা একটি পুরাতন ব্রহ্ম মন্দির, বোড়োদের শ্রদ্ধাকেন্দ্রকে জ্বালিয়ে দেয়। গোঁসাইগাঁও-এ ছাত্রদের ছাত্রাবাসও পুড়িয়ে দেয় এরা।'

এক ক্ষিপ্ত জনতা ২৪ জুলাই রাজধানী এক্সপ্রেস আক্রমণ করে। হিংসা বি টি এ ডি এলাকার ৪০০ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। ঘর-বাড়ি জ্বালানো হয়, পরিত্যক্ত হয়। বিদেশীদের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে মানুষ নিজভূমে শরণার্থী হয়ে যায়। শরণার্থী শিবিরগুলি দশা অত্যন্ত খারাপ। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, নেই খাবার-দাবারও। তার সঙ্গে

দীর্ঘ চারদিন মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশকর্তার সময় হলো না উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করার। পরে প্রশ্ন করা হলে গগৈ পুরো দায় কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে কার্যত জনশূন্য কোকরাঝাড় পরিদর্শন করেন। আব্‌মসু এবং আমসু, সিমি-রই প্রকাশ্য সংগঠন যারা রাজ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এরা সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ ছড়িয়ে বাংলাদেশী মুসলিমদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। বোড়োল্যাণ্ডের অস্তিত্ব অনেকটা 'চিকেন নেকের' মতো যা উত্তরপূর্ব এবং অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে সংযোগস্থাপন করছে। আমসুর গুণ্ডাবাহিনী বোড়োদের জমি কেড়ে নিয়ে ঠেলে দিতে চাইছে ভূটান সীমান্তের ওপারে। সাম্প্রতিক দাঙ্গা ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তির উপর হামলা। কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত জনৈক জওয়ান জম্মু-কাশ্মীরে কাজে যোগদান করতে যাবার পথে খুন হন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমী বোড়োদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে অ-বোড়ো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমঝোতা করতে বলা হয়।

যখন এই প্রতিবেদন লিখছি তখনই বোড়ো এলাকায় নতুন করে দাঙ্গার খবর আসে এবং পাঁচ বোড়ো খুন হন। ফোনে অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি প্রমোদ বোড়ো জানান যে, অসম সরকার বোড়োদের শরণার্থী শিবির ছেড়ে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত বাড়িতে ফিরে যেতে বলছে। সরকারি এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রমোদ বোড়োর সঙ্গে গোর্খা, বাঙালী, কাছাড়ী, রাজবংশী নেতারা গুয়াহাটিতে অনশন ধর্নায় বসেন ৭ আগস্ট।

কোকরাঝাড়বাসীদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়ায় কিছু তথাকথিত নিরপেক্ষবাদী যারা এই ধ্বংসলীলায় বোড়োদের দোষী সাব্যস্ত করে। নন-বোড়ো সংগঠনগুলি সমবেতভাবে বোড়ো বিরোধী এবং আবমসু এবং আমসুদের সমর্থক যা কার্যতঃ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। আমি অগপ-র নেতা প্রফুল্ল মহন্তর সঙ্গে দেখা করি গুয়াহাটিতে এবং তাঁকে বলি অসম এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে বোড়োদের সমর্থনের জন্য। উনি মেনে নেন মুসলিম অনুপ্রবেশের ভয়াবহতার কথা এবং এর বিরুদ্ধে এক সঙ্গে লড়ার ইঙ্গিতও দেন।

গুয়াহাটির বিবেকানন্দ সংস্কৃতি কেন্দ্রে এক বিশেষ সভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রী দীপক বড়ঠাকুর এবং অন্য বক্তারা বোড়োদের সংঘর্ষের ঘটনায় সরকার এবং মিডিয়ার ঔদাসীন্যের কড়া সমালোচনা করেন। আমি ওঁদের সবাইকে বললাম, বোড়োদের আস্থা ফেরাতে এবং তাদের মানসিক ক্ষতে প্রলেপ দিতে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রীসহ একটি অসমীয়া দল বোড়োল্যান্ডে যাক।

এখন হিন্দু সমাজের ভাববার সময় এসেছে যে তারা তাদের পতন রুখতে উত্তর খুঁজুক কীভাবে বিদেশীরা এত শক্তি সঞ্চয় করে ভূমিপুত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা পায়। আমরা দেখেছি কাশ্মীরে ধ্বংসলীলা, উপত্যকা থেকে কীভাবে হিন্দুদের উৎখাত করে হিন্দুশূন্য করা হয়েছে। কাশ্মীরের পুনরাবৃত্তি কি বোড়োল্যান্ডে দেখব? আর আমরা জাতি হিসেবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে জাতীয়বিরোধী শক্তি দ্বারা নিগৃহীত হব? □

(লেখক রাজ্যসভার সদস্য, 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বর্তমানে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা।)

কোকরাঝাড়ের জাতিদাঙ্গা

হিন্দুদের একত্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন

বাসুদেব পাল

জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গা, মারামারি, কাটাকাটি দেশ ও জাতির পক্ষে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক, আদৌ কাম্য নয়। তবুও এরকম ঘটনা কোথাও ঘটলে তার কারণ ও পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন— যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অসমের কোকরাঝাড় জেলার এবং পাশাপাশি অন্য কয়েকটি জেলার পরিস্থিতির আলোচনা প্রয়োজন।

সইতেশ্বর ব্রহ্ম। বয়স প্রায় ৮০ বছর। কোকরাঝাড় জেলার কাসুলতা গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় কৃষক। বাংলাদেশী মুসলমানরা তাঁর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। এখন তিনি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর কথায়— ''আমার বয়স যখন কুড়ি তখন আমাদের গ্রামে মাত্র দশঘর মুসলমান ছিল। এখন তো এক লক্ষ মুসলমান আমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।'' অবশ্য শ্রী ব্রহ্ম 'বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট'-এর চেয়ারম্যান হাগ্রামা মহিলারিকেও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। ঈদের সময় মুসলমানদের টি-সার্ট বিলিয়েছেন হাগ্রামা। অথচ গরীব বড়োদের প্রতি তাঁর কোনও দৃষ্টি নেই। মুসলিম ভোটের জন্যই এই তোষণ। তবে হাগ্রামারা আর কোনওদিন মুসলমান ভোট পাবেন না, এটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। আগেও কোনওদিন পেয়েছেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহ আছে।

মজার কথা হলো একদা পূর্ববঙ্গ, পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমানদেরকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা একবারও 'অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমান' না বলে 'অভিবাসী বাংলাদেশী' আখ্যায় ভূষিত করে চিহ্নিত করছে। অর্থাৎ আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশী। অবশ্যই দৈনিক 'বর্তমান'-এর মতো দু'-একটি পত্র-পত্রিকাকে ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে।

স্বহস্তে ত্রাণবিলি করছেন ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া।

একদা কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অসমের দেবকান্ত বরুয়া দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলেছিলেন— তাদের ভোটব্যাঙ্ক হলো আলি, কুলি ও বাঙালি। এখানে 'আলি' মানে বাংলাদেশী মুসলমান এবং 'কুলি' মানে ভারতের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আগত এবং চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণী। এবার ওই 'আলি'দেরকে বড়োল্যান্ডে আর 'এলাউ' করতে রাজী নন বড়ো নেতৃবৃন্দ।

২০১১-তে অসমের ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৫৫ লক্ষই তথাকথিত অভিবাসী বাংলাদেশি মুসলমান। তবে বিগত দুটি সাধারণ নির্বাচন (বিধানসভা) থেকে অসমের রাজনীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। আবির্ভাব হয়েছে এক নবগঠিত দলের— এ আই ইউ ডি এফ বা অল অসম ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর। ২০০৬-এ দলের এম এল এ-র সংখ্যা ছিল ৬ জন। এবার ২০১১-তে তা তিনগুণ বেড়ে হয়েছে ১৮ জন। রাজ্য বিধানসভায় দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ দল। ২০১১-র অসম বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস মুসলমান (বাংলাদেশী) ভোট-এর শতকরা ৩৬ ভাগ পেয়েছিল, এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮ শতাংশ। আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই সবটাই যদি এ আই ইউ ডি এফ পায় তাহলে অবাক হবার কোনও কারণ নেই। এবং সেটাই হবে কোকরাঝাড়ের পরিকল্পিত (?) দাঙ্গার পরিণতি।

ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে নানাকথা শোনা গেলেও বিশ্বস্ত সূত্রমতে— অসম পুলিশ থেকে বহিষ্কৃত রাতুল ইসলাম নামে এক যুবকের অশ্লীল কাণ্ডকারখানা থেকে এর সূত্রপাত। সে দু'জন মুসলমান মেয়ের জোরজবরদস্তি করে ছবি তোলে এবং তা প্রচার করে। এই নিয়ে অল বোড়োল্যাণ্ড মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং অল অসম মাইনরিটি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের মধ্যে মারপিট হয়। এই ঘটনায় ২/৩ জন মারা যায়। দোষটা পড়ে বোড়ো জনজাতিদের উপরে। এটা নিঃসন্দেহে পূর্ব পরিকল্পিত। এরপর চারজন বড়ো খুন হয়। এবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জাতিদাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। লুটপাট ও

সেবা ভারতীর চিকিৎসা-বাহনে চিকিৎসকবৃন্দ

অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে থাকে। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তা যাঁরা ত্রাণশিবির এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তাঁদেরকে এসব কথা বলেছেন ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষেরা জানিয়েছেন, সম্পন্ন বড়ো জনজাতিদের ঘরের দামী জিনিসপত্র বাংলাদেশিরা প্রথমে লুট করে ট্রাকে করে নিয়ে যায়। যাওয়ার আগে পেট্রোল বা কেরোসিন ঢেলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ কিছু মানুষের বক্তব্য, প্রাণহানি কমবেশি হলেও ক্ষয়ক্ষতি বোড়োদেরই বেশি। এছাড়া এই এলাকায় বোড়ো ছাড়াও কোচ, রাজবংশী ও সাঁওতাল জনজাতিরাও বসবাস করে। তাদের কথা বিশেষ করে কোনও গণমাধ্যমে আসেনি।

এখন অসমের শতাধিক ত্রাণশিবিরে ৩-৪ লক্ষ মানুষ রয়েছেন। এক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক বিভাজন পরিস্কার, মুসলমানরা যেখানে আছেন বড়ো ও অন্যা জনজাতিরা সেখানে যাচ্ছেন না, আর মুসলমানরাও বোড়ো ও অন্য হিন্দু জনজাতিদের ত্রাণশিবিরে ঘেঁষছেন না। কয়েকজন ডাক্তার মুসলমানদের ত্রাণশিবিরে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সহায়ক-সহায়িকা রয়েছেন তাঁরা কিন্তু মুসলমান। ডাক্তারদের বক্তব্য— ওই সব ত্রাণশিবিরে সদ্য বাংলাদেশ থেকে আসা বহুসংখ্যক মুসলমান ত্রাণের সাহায্য পেতে ভিড় জমিয়েছে। ঘটনা হলো, তাদের সংখ্যাই ত্রাণশিবিরে শতাংশের হিসেবে বেশি। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড় ঘুরে গেছেন। তিনশ' কোটি টাকা ত্রাণ সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। ঘুরে গেছেন ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন এবং অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধী স্বয়ং। ধুবড়ির সাংসদ এ আই ইউ ডি এফ-র সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল কোকরাঝাড়, ধুবড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হায়দরাবাদের সাংসদ মৌলানা আসাদুদ্দিন ওবৈসি। আজমলের সঙ্গে ঘুরছে তার স্নেহধন্য বৈদ্যুতিন চ্যানেল টি-২৪-ও। নানাকথা গুজবের আকারে কোকরাঝাড় ও ধুবড়ির আকাশ-বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুসলমানদের উপর আক্রমণের ভিডিয়ো ক্লীপস্ তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মুসলমান যুবকদের মোবাইলে। তাদেরকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ঈদের পরই বদলা হবে। ধুবড়িতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা আতঙ্কিত। ইতিমধ্যে ২৩ জুলাই ধুবড়িতে মিছিলে মহড়া হয়ে গিয়েছে একদফা।

এখনও যদি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সাংবাদিক ছাড়া অন্য কোনও স্বেচ্ছা-সেবীদেরকে মুসলিম ত্রাণশিবিরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সেবাভারতী (অসম)-র পক্ষ থেকে ব্যাপক ত্রাণকার্য চালানো হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনও সেবাভারতীকে সহযোগিতা করছে। স্বহস্তে ত্রাণ বিলি করে গিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। হতভাগ্য হিন্দু জনজাতিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, স্বচক্ষে দেখে গিয়েছেন ধ্বংসস্তূপ। ভিটেমাটি বাঁচিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সকল হিন্দুজনজাতিকে একত্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ▯

অসমে জনভারসাম্যের পরিবর্তন : ১১টি জেলায় মুসলিমদের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি

জেলার নাম	মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি (১৯৯১-২০০১)	অমুসলমান	মোট বৃদ্ধি*	মোট বৃদ্ধি (২০০১-১১)
বনগাঁইগাঁও	২৮.৩%	১২.৫%	১৭.১%	১৯.৬%
বরপেটা	২৪.৮%	১৪%	১৮.৩%	২১.৪%
দরং	২৬.৪%	১৩.১%	১৭.৪%	১৯.৫%
নওগাঁ	২৮.৭%	১০.৩%	২০.১%	২২.৯%
ধুবড়ি	২৯.৫%	৭.১%	২২.৯%	২৪.৪%
গোয়ালপাড়া	৩১.৭%	১৪.৪%	২৩%	২৩%
ঢেমাজি	২৭.৩%	১৪.৪%	১৮.৯%	২০.৩%
কাছাড়	২৪.৬%	১৬%	১৮.৯%	২০.১৭%
মরিগাঁও	৩০.৪%	১৩.২%	২১.৭%	২৩.১৭%
হাইলাকান্দি	২৭.২%	১৩.৩%	২০.৯%	২১.৪%
করিমগঞ্জ	২৯.৪%	১৪.৫%	২১.৯%	২০.৭%

** ২০০১-২০১১ এই দশ বছরে মুসলমান ও অমুসলমান বৃদ্ধির পৃথক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।*

অসম সমস্যা সমাধানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে দেশকে বিপন্ন করেছে কংগ্রেস

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বকে হেলায় তুচ্ছ করে ভোট কুড়িয়ে ক্ষমতায় থাকার মতো হীন কাজ পৃথিবীতে কেবল ভারতবর্ষের মতো দেশেই সম্ভব। তা না হলে অসমে বিরামহীন বেআইনী অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হওয়া দু-দুটি মামলায় আদালতের নির্দিষ্ট রায়কে এমন চতুরতার সঙ্গে অসম ও কেন্দ্রীয় সরকার অমান্য করে কি করে? নিরন্তর অনুপ্রবেশের ফলে অসমের চারটি জেলায় জনসংখ্যার ভীতিপ্রদ পরিবর্তনকে জনআগ্রাসন বলে আখ্যা দিয়ে ২০০৫-০৬ সালে আদালত এর থেকে পরিত্রাণের সুনির্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও অসমের রাজ্য সরকার একেবারে আক্ষরিক অর্থেই তার অবমাননা করে চলেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগত বিপুল জনসংখ্যার চাপে দেশ হিমসিম খায়। দেশের পক্ষে ধ্বংসাত্মক এই প্রবণতাকে আগ্রাসন হিসেবে চিহ্নিত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে দীর্ঘ ৪০টি বছর পার হওয়ার পর এই বেআইনী অনুপ্রবেশকারীরাই নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক দলের বহুমূল্য ভোটব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ভোটব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখতে এই বেআইনী দখলদার চিহ্নিতকরণ ও তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর মতো জাতীয় স্বার্থের পক্ষে জরুরি বিষয়টিতে সর্বোচ্চ আদালতের দুটি রায়কে তারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবে উপেক্ষা করে চলেছে।

ভারতের অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ষষ্ঠ কমিটি 'আগ্রাসনে'র সংজ্ঞা নিয়ে গুরুগম্ভীর বিতর্ক শুরু করেছিল। এই প্রাসঙ্গিক বিতর্কে অংশ নিয়ে ভারতের প্রতিনিধি ডঃ নগেন্দ্র সিং দীর্ঘ সওয়াল করেন। গভীর আশঙ্কা ব্যক্ত করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে বিরামহীন জনঅনুপ্রবেশকে আগ্রাসন আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই ঘটনায় ওই অঞ্চলের জনসংখ্যার কাঠামোতেই অস্বাভাবিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ

দাউ দাউ করে জ্বলছে হিংসার আগুন।

অসমের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখেন বিদ্যার্থী পরিষদের এক সর্বভারতীয় প্রতিনিধি দল। রয়েছেন পরিষদের জাতীয় জনজাতি প্রমুখ প্রফুল আকান্ত ও অসমের রাজ্য সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বহড়া।

সৃষ্টির লড়াইয়ে ভারত মুক্তিবাহিনীকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

ডঃ সিং তাঁর বক্তব্যে বার্মা ও ইংল্যাণ্ডকে সমর্থন করে বলেছিলেন, আগ্রাসনের সংজ্ঞা অপ্রত্যক্ষ আগ্রাসন ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। হলে তা বহু দেশের পক্ষে হবে বিপজ্জনক। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ''এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ধীরে কিন্তু বিরামহীন প্রবাহে পালিয়ে যেতে সফল। এটি একটি রক্তপাতহীন আগ্রাসন তো বটেই। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ঊর্ধ্বে এই অগুনতি নিরস্ত্র মানুষের স্রোত আর একটি দেশের ভূমিকে অবরুদ্ধ করে ফেলার ফলশ্রুতিতে সেই আক্রান্ত দেশটির অর্থনীতি, রাজনীতি, জনকল্যাণের কাজকর্মই শুধু ধ্বংস হয়ে যাবে না, অচিরেই তার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হতে পারে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি নিশ্চিতভাবে আতঙ্কিত এই চরিত্রের অনুপ্রবেশকে আগ্রাসন হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।'' বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জোরালো দাবি জানিয়ে বলেন, ''এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট সীমান্ত অঞ্চলে কোনও রকম সশস্ত্র সংঘর্ষ নাও হতে পারে। কেননা, অনেক সময়ই লড়াই একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই সংঘর্ষের পরিণতিতে যদি একটি দেশ থেকে পলাতক জনস্রোত অন্য দেশটিতে ঢুকে সেখানে জনপ্লাবনের পরিস্থিতি তৈরি করে, তবে এই নীরব অনুপ্রবেশ একটি জঘন্যতম আগ্রাসন হিসেবেই গণ্য হবে।'' এক দেশ থেকে আর এক দেশে শরণার্থীর এই নিয়ন্ত্রণসীমার ঊর্ধ্বের অনুপ্রবেশকে আগ্রাসন বোঝাতেই ডঃ সিং এত কথা বলেছিলেন।

অনুপ্রবেশকারীদের হামলায় বিধ্বস্ত বাড়িঘর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরেও এই বেআইনী অনুপ্রবেশে কোনও ভাটা পড়েনি। মনে থাকতে পারে, ৬ বছরের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের পর ১৯৮৫ সালে অসমের তৎকালীন ছাত্রনেতাদের সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এক চুক্তি হয়, যেটি 'অসম চুক্তি' নামেই সকলে জানেন। এই চুক্তির মধ্যে কিন্তু দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিক্‌নির্দেশ ছিল।

এদিকে ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে অসমের তৎকালীন রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে একটি গোপন নোটে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন যে, বাংলাদেশ থেকে অবিরাম বেআইনী অনুপ্রবেশ সেখানকার জনবসতির ভারসাম্য নষ্ট করে বসবাসকারী অসমীয়াদের আপন রাজ্যেই অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে দিয়েছে। এই অনুপ্রবেশের কারণেই অসমে নানান স্থানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্টের সর্বানন্দ সনোয়াল মামলায় ২০০৫ (৫) এস সি সি ৬৬৫ উল্লেখ করে রাজ্যপাল জানান, ''বেআইনী অনুপ্রবেশ কেবলমাত্র অসমবাসীর ওপরই ধ্বংসাত্মক প্রভাব আনছে না, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকেও বিঘ্নিত করে তুলছে। পাকিস্তানের আই এস আই বাংলাদেশে অতি সক্রিয় থেকে অসমের চরমপন্থীদের মদত দিচ্ছে। যার ফলে অসমে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমগ্র ভূমি তার যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ সমেত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, যা ভারতভূমিকে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও অবস্থানগত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।''

অনুপ্রবেশ নিয়ে এই ভয়ানক রাজনৈতিক খেলা প্রথম নজরে পড়ে ২০০০ সালে। সাম্প্রতিক দাঙ্গা, হানাহানি সেই দীর্ঘস্থায়ী সজীব অনুপ্রবেশ দৈত্যের হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠারই একটি পর্ব। আশঙ্কার কথা, উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলিও আতঙ্কিত চিত্তে তাদের রাজ্যেও জনভিত্তির ভারসাম্যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করছে।

সর্বোচ্চ আদালতের দুটি রায়ের নৈতিকভাবে অবমাননাকারী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কংগ্রেসের জন্ম দেওয়া সমস্যার বলিষ্ঠ ও নিশ্চিত মোকাবিলা করতে হবে। উদ্ভূত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এড়িয়ে যাওয়ার অবকাশ নেই। কোনও টালবাহানা করলে অসমের জ্বলন্ত সমস্যা কিন্তু অসম সংলগ্ন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে তো ছড়াবেই, আঁচ পড়তে শুরু করবে দেশের অন্যান্য অংশেও।

হিন্দুর ক্ষতি

গত ১০ জুলাই ২০১২, ৪৮ সংখ্যার স্বস্তিকায় শিবাজী গুপ্ত 'হিন্দুর ক্ষতিসাধনে কার বেশি ক্ষমতা' প্রবন্ধে, গান্ধী নেহরু প্রমুখদের তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশি উৎসাহী বলে তুলে ধরেছেন। তিনি চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করেননি। চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের ৮০ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন— কিন্তু অনেকের প্রবল বিরোধিতায় ৬০ শতাংশ রফা হয় ১৯২৩ থেকে। ফলে বাংলার মুসলমানেরাই প্রতিষ্ঠা পায় প্রবল বেগে ১৯৩৭ থেকেই। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য হলো গান্ধী ৩১ বছরে শত প্রশ্রয় দিয়েও ১৯৪৬-এ স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, দেশের ৮ কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজনকেও প্রেমের দ্বারা জয় করতে পারেননি। দেশটি ভাগ হয়। কম্যুনিস্টরা ৫০ বছর ধরে (৩৪ বছর নয়) মুসলমানদের সেবা করেও কিছু হলো না।

যথা সময়ে গণেশ উল্টে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও গান্ধীর ভুলই করছেন। গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা সভায় রামধুন গাইতেন, 'ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম', তাতে মুসলমানদের ঘৃণার শিকার হন। কারণ তারা আল্লাকে ঈশ্বরের সমান মনে করেন না। এই বোধ গান্ধীজীর ছিল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিস্তার পুরো জল বাংলাদেশকে না দিয়ে সমস্ত মুসলমানদের ক্রোধের শিকার হলেন। তাঁর হিজাব পরা, ইফতার, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ শতাংশ ও বি সি ইত্যাদি সব তিস্তার জলেই ভেসে যাবে। সময়টা আসুক। তিনি কি লক্ষ্য করছেন না যে আফজল গুরু বা কাসভের কোনও সাজাই হচ্ছে না— মুসলমানদের মুখ বেঁকা হবে বলে।

—ভূপতি চরণ দে, কলকাতা-৭৫।

মৃত্যুদণ্ড

দীর্ঘ সময় ধরে এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীরা পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় গ্রামের হাটে পরিণত করেছে। যেখানে সেখানে যখন তখন লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট, কোটি কোটি টাকার সর্বনাশা মাদক দ্রব্য এবং বিশাল পরিমাণ বিস্ফোরকসহ অত্যাধুনিক বে-আইনি অস্ত্র ব্যাপক পরিমাণে বেচা কেনা চলছে। মাঝে মধ্যে কিছু কিছু ধরা পড়ছে বটে তবে তাকে সিন্ধুতে বিন্দু বলা যেতে পারে। বেশ কিছু বছর ধরে গ্রাম ও শহরের মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে ৫০০ ও ১০০০ টাকার জাল নোট নিয়ে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বাজারে ব্যাপক ১০ টাকার জাল নোট পাওয়া গেছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যাঙ্ক থেকে এবং এ.টি.এম থেকে তোলা টাকার মধ্যে জাল নোট পাওয়া গেছে। ওই জাল নোট ব্যাঙ্কে ফেরৎ দিতে গেলে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ নোট ফেরৎ নিতে কেবল অস্বীকারই করেনি কাউকে কাউকে সময়ে সময়ে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলেছে বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করলে আপনাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হবে। গত ১৮ মে মালদার রথবাড়ি এ.টি.এম থেকে ৩০ হাজার টাকার জাল নোট বেরিয়েছে। গত মে মাসের শেষে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের ইউকো ব্যাঙ্কে কোটি টাকার দুর্নীতি ধরা পড়েছে এবং তদন্তে জানা গেছে ওই ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকজন কর্মচারী ঘটনায় জড়িত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় একশ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সহায়তা ছাড়া কখনও ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাহককে দেওয়া এবং এ.টি.এম থেকে জাল নোট পাওয়া সম্ভব নয়। একইভাবে পুলিশ প্রশাসন ও অন্যান্য প্রসাশনিক অধিকারীদের সহায়তা ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এত ব্যাপক জাল নোটের কারবারসহ মাদক দ্রব্যের আমদানী এবং বিস্ফোরক সহ ভয়ঙ্কর বেআইনি অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রশাসনিক প্রধানগণসহ মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীগণের নিকট জিজ্ঞাসা— আপনারা কী কিছুই দেখতে বা বুঝতে চান না? আপনাদের ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের কারণে দুষ্কৃতকারীদের এত বাড়-বাড়ন্ত। এই ধরনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর কাজ রোধ করতে চাই কঠিন আইন প্রণয়ন। বমালধরা দুষ্কৃতকারীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণে অসুবিধা কোথায়?

—অমরকৃষ্ণ ভদ্র, হাকিমপাড়া,শিলিগুড়ি।

গোরক্ষা ও সনাতন ধর্ম

মহাভারতের যুদ্ধ জয় ও কিছুকালের জন্য হলেও ভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব যে সনাতন ধর্ম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা কেবলমাত্র তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কর্তৃক ব্রাহ্মণের গোমাতা উদ্ধার ও রক্ষা— এই মহাপুণ্যকর্মের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

কারণ, ব্রাহ্মণের গোধনকে রক্ষার জন্য অর্জুনকে অসময়ে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করার অপরাধে এক বৎসর বনবাসে যেতে হয়েছিল। সেখানে থাকাকালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন মহাদেবের তপস্যা করে তাঁর সন্তোষ ও দর্শনলাভ করেছিলেন।

মহাদেব কর্তৃক পাশুপত অস্ত্র ও অন্যান্য দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করেছিলেন। এর দ্বারাই পঞ্চপাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় ও ভারতে সনাতনধর্ম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

তাই সকল শুভকল্যাণাকাঙ্ক্ষী ভারতবাসীকে অনুরোধ করি আপনারা অন্ততঃপক্ষে একটি অনাথ গোমাতা— অর্থাৎ কসাইয়ের কাছে বিক্রী করার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে এক গোমাতাকে ক্রয় করে নিজগৃহে পালন করুন— গোমাতাকে পূর্ণ জীবন সুরক্ষা প্রদান করুন। গোমাতা সর্ব দেবদেবীময়, সর্ব ঋষিগণ গোমাতার শরীরে বাস করেন। ভারতের মহর্ষিগণ, উচ্চ কোটি সাধকগণ, শাস্ত্রভগবান সকলেই একথা ঘোষণা করে গেছেন। এর দ্বারা ভারতে অতি সত্বর সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে ও সকলেই পর্যাপ্ত সুখ ও শান্তি লাভ করবেন।

—অমরনাথ দে, কলকাতা-৯।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ে
মাত্র দুই মিনিটে (ৈর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

তীর্থকথা

শ্রীশৈলম

নবকুমার ভট্টাচার্য

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন। মল্লিকার্জুন মহাদেব দর্শন করতে গেলে যেতে হবে শ্রীশৈলমে। রাজীব গান্ধী জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে পথ গেছে শ্রীশৈলমে। নাল্লামালাই পাহাড়ের পাদদেশ ডোনালা থেকে পথ গেছে ঊর্ধ্বমুখী, সঙ্গে জঙ্গলের রোমাঞ্চ। এখানে কৃষ্ণা নদী বাঁধা পড়েছে। শ্রীশৈলম যাবার পথে পড়বে নার্গার্জুন

বাঁধ।

কীভাবে যাবেন :

শ্রীশৈলম যেতে গেলে প্রথমে আপনাকে যেতে হবে হায়দরাবাদ। হাওড়া থেকে ১২৭০৩ আপ ফলকনামা সুপার ফাস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ছে প্রতিদিন সকাল ৭টা ২০ মিনিটে। পৌঁছোয় পরেরদিন সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। স্লিপারে ভাড়া ৪৪৯ টাকা ও এ সি থ্রিটায়ারে ১১৮৭ টাকা। এই ট্রেনটি যায় সেকেন্দ্রাবাদ পর্যন্ত। হাওড়া থেকে ছাড়ছে সন্ধ্যে ৬টা ৩০ মিনিটে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দরাবাদের দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। বাস বা অটোতে যাওয়া যেতে পারে। অটোর ভাড়া জনপ্রতি ১০ টাকা।

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে কনডাকটেড ট্যুরের বাস ছাড়ছে প্রতিদিন শ্রীশৈলম যাওয়ার জন্য। সেকেন্দ্রাবাদের যাত্রী নিবাস থেকে এই বাস ছাড়ছে প্রত্যহ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এবং ফিরছে পরের দিন রাত্রি ৮টায়। খরচ বড়দের মাথাপিছু ১২০০ টাকা এবং ছোটদের ১০০০ টাকা। যোগাযোগ : এস টি ডি ০৪০, ফোন : ২৭৮৯৩১০০/ ৬৬৩৮-৭৫৯৮।

এছাড়াও হায়দরাবাদের মহাত্মা গান্ধী বাসস্ট্যাণ্ড থেকে শ্রীশৈলম যাবার বাস ছাড়ছে ভোর থেকে প্রতি ৪৫ মিনিট অন্তর। দূরত্ব ২৩৫ কিমি। সময় লাগে সাত ঘণ্টার মতো। সরকারি এই বাসের ভাড়া ৬০ থেকে ৯০ টাকা পর্যন্ত। এক্সপ্রেস ও লাক্সারি বাস অনুসারে ভাড়া।

কোথায় থাকবেন :

শ্রীশৈলমে থাকার জন্য রাজ্যপর্যটনের হোটেল রয়েছে (২৮৮৩১১)। ভাড়া ১৩০০ টাকা, ডর্মিটরি ১৫০ টাকা। রয়েছে মন্দির কমিটির গেস্ট হাউস। এছাড়া ছোটবড় নানা হোটেল ও ধর্মশালা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জন্য রয়েছে 'শিবাজী মূর্তি নিবাস'। যোগাযোগ : গিরিধরজী মোবাইল : ০৯৪৪০৪৫৫২৩৫। মন্দির থেকে ১০০ মিটার দূরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিবাজী সম্পর্কিত এই সংগ্রহশালাটি এবং যাত্রীনিবাস।

কী দেখবেন :

শ্রীশৈলমে পড়েছিল সতীর গ্রীবাংশ। এই স্থান শঙ্করাচার্যের তপস্যাস্থান। এখানে রয়েছে ছোট বড় অনেকগুলি বৈদিক বিদ্যালয়। খুব ভোরে আপনার ঘুম ভাঙবে সমবেত বৈদিক মন্ত্রের ধ্বনিতে। মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বহু প্রাচীন। এই মন্দিরের বিবরণ পাওয়া যাবে মহাভারতে, হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে। চারিপাশে বিশাল বড় বড় পাথরের গোপূরম, মাঝে সোনার শিখর মোড়া মন্দির। গর্ভগৃহে অলংকার ভূষিত জ্যোতির্লিঙ্গ। শ্রাবণ মাসে বড় উৎসব হয় শ্রীশৈলমে। প্রসাদ গৃহে বিক্রি হয় প্রসাদ। মন্দিরে ঢোকার জন্য লাইন পড়ে আবার টিকিট কেটে বিশেষ লাইনেও ঢোকা যায়। বাবার মন্দিরের পাশে পার্বতী মায়ের মন্দির।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান :

শ্রীশৈলম খুব ছোট পাহাড়ি শহর। হেঁটেই পাহাড়ী শোভা উপভোগ করা যায়। রয়েছে গণপতি মন্দির। পানধারা পঞ্চধারা দেখে নেওয়া যায় পথ চলতে চলতে। স্নান করা যেতে পারে পাতাল গঙ্গার ঘাটে। এখানে কৃষ্ণার জলে হরিদ্বার বেনারসের মতো পুজো ভাসানো হয়। রাতে প্রদীপ ভাসানোর রীতিও রয়েছে। নৌকোয় চেপে কিছুক্ষণ ঘুরতেও পারা যায়।

পাহাড় জঙ্গল এবং দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীধারায় শ্রীশৈলম এক অন্যতম তীর্থকেন্দ্র হিসেবে দর্শনীয়। মনে রাখা প্রয়োজন রাত্রি ৯টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত শ্রীশৈলম যাওয়া আসার রাস্তা বন্ধ থাকে। পশুপাখিদের রক্ষার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা। ▯

বঙ্গ-প্রতিভার আঁতুড়ঘর এক সন্ন্যাসী

অর্ণব নাগ

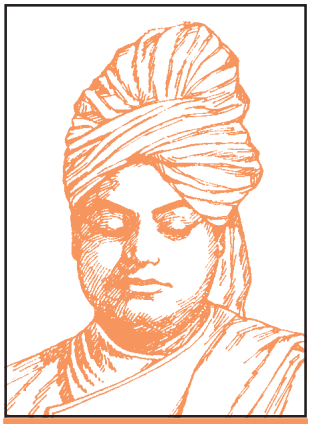

বঙ্গে বিবেক-তীর্থ

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

উত্তর কলকাতার সিমলার দত্তদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা বিবেকানন্দের দুই অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে আমাদের জানা। স্বামীজী'র কাকা তারকনাথ দত্ত ছিলেন ঠাকুরবাড়ির এস্টেটের উকিল। স্বামীজী'র এক দাদু 'নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম' গোপালচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য, দত্ত পরিবারের তিন পুরুষের সঙ্গেই পরিচয় ছিল মহর্ষির। কিন্তু তার বহুপূর্বেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল (স্বামী বিবেকানন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত)। নরেন দত্তের সঙ্গে দেবেন ঠাকুরের একাধিক সাক্ষাতের কথা এবং উভয়ের আধ্যাত্মিক আলোচনা স্বামীজী'র জীবনীকারেরা বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ঠিক কোন সময় থেকে ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াতের সূচনা হয়েছিল বিবেকানন্দের? ঠাকুরবাড়ির ছেলে দ্বীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বের কথা সর্বজনবিদিত। তবে ঠিক কোন সময়ে তাঁরা বন্ধু ছিলেন এনিয়ে সামান্য সংশয় রয়েছে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ দ্বীপেন্দ্রনাথকে নরেন্দ্রনাথের কলেজ জীবনের বন্ধু বললেও, দ্বীপেন্দ্রজায়া হেমলতাদেবী তাঁর স্বামীকে নরেন্দ্রনাথের স্কুল জীবনের বন্ধু বলেই অভিহিত করেছেন। এবং সবদিক সাবধানে বিচার-বিবেচনা করে হেমলতাদেবীর বক্তব্যকেই সঠিক বলে মনে হয়। আর এই সূত্রে 'রবিজীবনী'কার প্রশান্তকুমার পালের অনুমান, "জানুয়ারি ১৮৭৬ (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩)-এর পূর্বেই তাঁদের (নরেন্দ্রনাথ-দ্বীপেন্দ্রনাথ) সহপাঠী থাকা সম্ভব, কারণ ১৬ জুন (৩ আষাঢ়) দ্বীপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়— নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে বারো বছর। দ্বীপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন জানুয়ারি ১৮৭৫-এ (নরেন্দ্রনাথ তখন সেখানে ফিফথ ক্লাসে পড়ছেন)। সুতরাং তাঁরা প্রায় দেড় বছর একসঙ্গে পড়েছিলেন। এরপরে ১৮৭৭-এ নরেন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে রায়পুরে চলে যান এবং ১৮৭৯-এ কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে এন্ট্রাস পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সুতরাং সহপাঠী দ্বীপেন্দ্রনাথের সূত্রে ১৮৭৫-৭৬-এ তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া-আসা করে থাকতে পারেন, রায়পুর থেকে ফিরে আসার পরও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা।"

সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কী উষ্ণ অভ্যর্থনা স্বামীজী ঠাকুরবাড়িতে পেতেন তার বিবরণ শুনুন প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথের মুখেই, "বিবেকানন্দ দীপুদাদার (দ্বীপেন্দ্রনাথের) ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলেন। ...আমাদের বাড়িতে (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি) বিবেকানন্দ এলে দীপুদাদা 'কি হে নরেন?' বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালবাসা।" (জোড়াসাঁকোর ধারে, রাণী চন্দ অনুলিখিত)। নরেন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ির প্রতি আকর্ষণের মূল কারণ ছিল অবশ্যই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কথাতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যানগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। মহর্ষি নিয়মিত এঁদের ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী শিক্ষা দিতেন (এই শিক্ষা অবশ্য আদি ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে হওয়াই সম্ভব। অন্ততঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এটা হোত বলে কোনও প্রমাণ নেই)। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই সু-সম্পর্ক আজীবন বজায় ছিল। এমনকী নরেন্দ্রনাথের 'স্বামী বিবেকানন্দ'-এ রূপান্তরের পরও। এ সম্পর্কে হেমলতাদেবীর সাক্ষ্য, "বিবেকানন্দ যখন বাল্য বয়সে আমার স্বামীর (দ্বীপেন্দ্রনাথ) কাছে এসেছেন তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি— সে আমি দেখিনি। কিন্তু পরে বিবেকানন্দ আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছেন, পরনে গেরুয়া বসন, মাথায় পাগড়ি। আসতেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ-আলোচনা করে চলে যেতেন। ...আমার মনে আছে, চিকাগো পার্লামেন্ট অফ রিলিজন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকোতে এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন। কি কথা হয়েছিল আমার জানা নেই। তবে শুনেছি চিকাগো বক্তৃতার সম্পর্কে আমার দাদা (মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়)-র কথা বিবেকানন্দ বার বার উল্লেখ করেছিলেন।" (পুরানো কথা, দেশ, ৩৩ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)।

১৮৯৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের মনোমুগ্ধকর বিবরণ রয়েছে নিবেদিতার পত্রাবলীতে। ২৩ ফেব্রুয়ারির পত্রে নিবেদিতা মিসেস ওলি বুল-কে লেখেন, "গত রবিবার সকালের ব্যাপার। খুব সকালে গাড়ি এল। আটটার আগেই ওখানে পৌঁছলাম। বৃদ্ধ মিঃ টেগোর আর পার্কস্ট্রিটে থাকেন না। যেখানে জন্মেছেন সেখানে মরাই ভাল মনে করে এখানকার পারিবারিক ভবনে (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি) চলে এসেছেন। রোদ ছড়ানো ছাতের উপরে সাধাসিধে সুন্দর একটি ছোটঘরে রয়েছেন। আমাদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে যাওয়া হলো; পরিবারের দু'একজন সঙ্গে ছিলেন। স্বামীজী এগিয়ে এসে বললেন, 'প্রণাম'— আমি তা করলাম কয়েকটি গোলাপ ফুল দিয়ে। বৃদ্ধ প্রথমে আমাকে কিছু আশীর্বাদ করলেন, তারপর স্বামীজীকে বসতে বললেন, পরে দশ মিনিট স্বামীজী'র উদ্দেশে কথা বলে গেলেন। তারপর থেকে অপেক্ষা করলেন (স্বামীজীর উত্তরের জন্য)। স্বামীজী খুব বিনীতভাবে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। আশীর্বাদলাভের পরে, পূর্বোক্ত প্রকারে নমস্কারাদি জানিয়ে আমরা নীচের তলায় নেমে এলাম। স্বামীজী তখনি চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন প্রকার। তিনি ড্রইংরুমে আসার পরে সেখানে মিস টেগোর (সরলাদেবী চৌধুরাণী) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ক্রমে পরিবারের লোকজন, পুরুষ-মানুষেরাই প্রধানতঃ একে একে এসে জুটলেন। স্বামীজী চা খেতে চাইলেন না, তবে আমাকে তা দিতে বললেন। তিনি পরে পাইপ নিলেন। এইসব ছোটখাট ব্যাপার কথাবার্তাকে বেলা দশটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, চতুর্থ খণ্ড, শঙ্করীপ্রসাদ বসু)।

আমাদের খেদ কিন্তু একটাই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের বহুবার পদার্পণ ঘটেছে, কিন্তু এবাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে স্বামীজী'র মুখোমুখি সাক্ষাতের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে বঙ্গ-প্রতিভার আঁতুড়ঘরে বিবেকানন্দ ও একদা রামকৃষ্ণের উপস্থিতি যে বাড়িটি-কে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে ভাবীকালের কাছে তা অনস্বীকার্য। □

শিক্ষক দিবস পালনে হোতু-কোতুর উদ্যোগ

কোতুকে দলে পাবার পর অনেকটা জোর পেয়েছে হোতু— এটা সকলের সামনে বলেছে। নাম একরকম হলেও দুজনের মধ্যে আত্মীয়তা নেই। চেহারাতেও মিল নেই। একজন বেঁটে মোটা, অন্যজন লম্বা। তবে দুজনের মিল এক জায়গায়। কোতু সবসময় হোতুর সব কথা শোনে মন দিয়ে। সব কথাতেই অবাক হয়। রাখঢাক না করেই মনের ভাব জানায়, 'হোতুদা, আপনি কত কিছু জানেন, অথচ একটুও অহংকার নেই। সহজ করে বুঝিয়ে দেন আবার। আমার ক্ষমতা থাকলে শ্রীম-র মতো আপনার কথা কাগজে কলমে ধরে রাখতুম। আচ্ছা হোতুদা, আপনি টেপরেকর্ডার চালু করে ভাবনাগুলো বলে যেতে তো পারেন।' হোতু চোখ বন্ধ করে মুচকি হেসে কোতুর কথাগুলো শুনছিল। কোতু থামতে বলার পালা এলো তার, 'সেটা মন্দ বলোনি কোতুভাই! তবে কি জানো, তুমি যেমন নানারকম প্রশ্ন করে আমাকে ভাবাও, তেমন প্রশ্ন কারও কাছে মেলে না। সব যেন স্কুলের প্রশ্নহীন ছাত্র। কোনও জিজ্ঞাসা নেই। স্যার যা বলেন সব গিলে নেয়। আমিও উত্তর দেওয়ার জন্যে আনচান করি।'

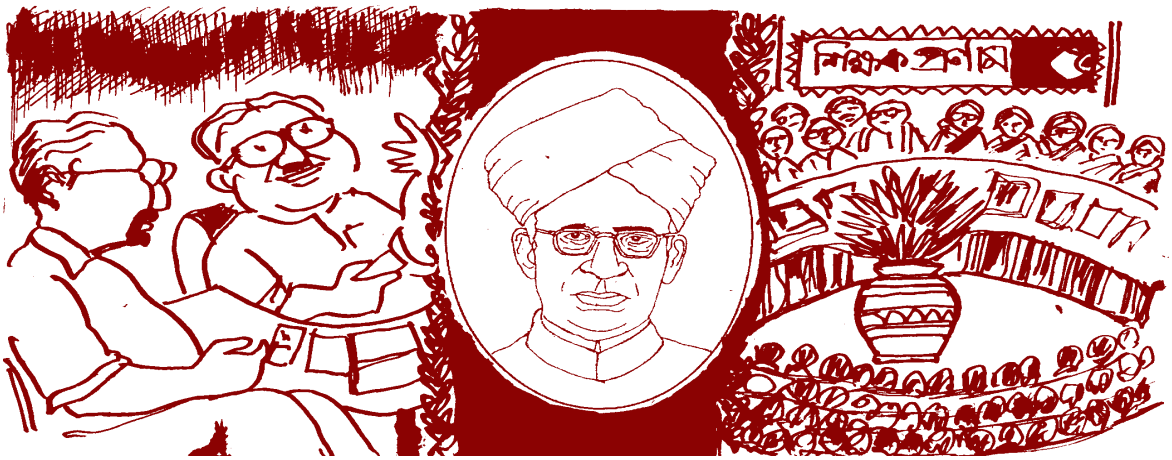

কোতু এবার বলল, 'তাহলে কিছু খাদ্যদ্রব্য আসুক।' হোতু বলল, 'একটু আগেই চিকলিকে আনতে দিয়েছি।' চিকলি অনেক বছর হোতুর সঙ্গে আছে। হোতুর আকার ইঙ্গিত ভালো বোঝে। ব্যবসায় সবকথা সবসময় বলতে নেই। চিকলির একটু বেশি ঝোঁক খাবার-দাবারের দিকে। কম পয়সায় ভালো খাবার আনে। খাবার পরিবেশনে দক্ষতা আছে। আর খাবার দাবার আনার সুবাদে কিছু আমদানির সুযোগ থাকে। চিকলির সঙ্গে সবসময় খিটিরমিটির শিটুর। চোখেমুখে কথা বলে শিটু। অনেকের মত, 'শিটু এক হাটে ছাগল কিনে অন্য হাটে ঘোড়ার দামে বেচে দিতে পারে।' হোতু জানে শিটুকে দিয়ে অনেক কাজ সহজে হয়। কোতুরও পছন্দ শিটুকে। কারণ শিটু নানারকম খবর দেয়। সেই-ই খবর দিলো, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে অনেক জায়গায়।

কোতু শুনে বলল, 'হোতুদা, আমরা তো ওইদিন কিছু করতে পারি।' হোতু কথাটা শুনে একটু গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, 'আমাদের লাভ?' কোতু তড়বড়িয়ে বলল, 'লাভ অনেক, লাভ অনেক।' ততক্ষণে চিকলি এনেছে গরম লুচি তরকারি ঠাণ্ডা বোঁদে। খাবার দেখলে কোতু অপেক্ষা করতে পারে না কোনও সময়। আটটা লুচি, পরিমাণ মতো তরকারি আর দুশো গ্রাম বোঁদে কোতু নিলো। বাকিদের চেহারা হালকা, খাবারের বরাদ্দও কম। কোতু লুচি তরকারি খেতে খেতে বলল, 'আইডিয়া মাথায় এসে গেছে। ডান হাতের কাজ সেরে বলছি।' হোতু বলল, 'তুমি ধীরেসুস্থে খাও। তারপর কথা হবে।'

'শিক্ষক দিবসে আগে ছাত্ররা মাস্টারমশাইদের প্রণাম করে চাঁদা তুলে খাওয়াতো, উপহার দিত।' হোতুর মনে পড়ল স্কুলের হেডস্যার কৃষ্ণসাধন দত্তের কথা। তাঁকে কখনও ছাত্ররা কোনও উপহার দিতে পারত না, খাওয়ানো তো দূরের কথা। মাস্টারমশাই প্রণাম নিতেন। প্রণামের পর দিতেন একটা করে বই। কম দামের হলেও হেডস্যারের কাছ থেকে পাওয়া বইয়ের অন্য মূল্য থাকত ছাত্রদের কাছে। কখনও টিউশন করতেন না। গরিব ছেলেদের স্কুলে ছুটির পর বিনা পয়সায় পড়াতেন, টিফিন খাওয়াতেন।

কোতু বলল, 'আমরা শিক্ষক দিবসে এলাকার সব অবসর নেওয়া শিক্ষককে সভায় ডেকে সংবর্ধনা দেবো। এবছর বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। তাঁদের মানপত্র-ধুতি-পাঞ্জাবি-মিষ্টি-ফুল পাঁচরকম ফল- কলম প্যাড বই দেওয়া হবে। প্রত্যেকের জন্যে খরচ হাজার টাকা। এছাড়া অন্যান্য খরচ আছে।' হোতু বলল, 'পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে বাজেটটা রাখো। তবে হ্যাঁ, নাম ঠিক করো কাদের সম্মান জানানো হবে। আমার প্রস্তাব রয়েছে একজন মানুষের নাম যেন তালিকায় থাকে। কৃষ্ণসাধন দত্ত। তাঁকে রাজি করানোর জন্যে আমি যাবো।'

কোতু নিজের জানাশোনা কয়েকজনের নাম ঢোকাতে চেয়েছিল। হোতু বলল, 'শোন, অনেক ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত হলেও এক্ষেত্রে নই। আমরা এবার সত্তর পেরুনো শিক্ষকদের সম্মান জানাবো।'

কোতু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো নিজের স্বভাবে। বলল, 'হোতুদা, আপনার সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক। সবকিছুর হোতা বলেই তো আপনি হোতুদা!' হোতু কথাগুলো হজম করে চিকলিকে ডেকে বললে, 'সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত অনেক কাজ থাকবে। কোনওরকম ফাঁকি চলবে না।' কথাটা কোতুকে শুনিয়েই চিকলিকে বললেন হোতু। ধুরন্ধর কোতু বলল, 'ঠিক কথা বলেছেন হোতুদা। দারুণ আপনার যুক্তি।'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

সুভাষজ্যেঠুর গল্প বলা

সুভাষজ্যেঠু বাড়িতে এলেই ছোটোদের মধ্যে বেশ খুশির ঢেউ বয়ে যায়। ছোটোরা জানে সুভাষজ্যেঠুর গল্পের ভাঁড়ার অফুরন্ত। কত গল্প বলে। বাড়িতে পাঁচ থেকে পনেরো বয়সী ছেলেমেয়ে ছজন। টুবান-বুটুন-মানু-সোম-রিয়া-অর্ক। যারা বড়ো হয়েছে তারা গল্পের বই পড়ে অনেক। ইংরেজি-বাংলা। নিজে পড়ার মজা আছে। সেটা ওরা পেয়েছে। বাড়িতে নিয়মিত বই আসে। বই ঢোকে প্রচুর। কোনও বই না-পড়া থাকে না। অনেক সময় বড়ো দাদা-দিদিরা গল্প পড়ে শোনায় ছোটো ভাই-বোনদের। তারা মজা পায়। বইয়ে আঁকা ছবিগুলো বার বার দেখতে চায়। তবে সুভাষজ্যেঠুর মতো গল্প বলতে পারে না কেউ। সুভাষজ্যেঠু কীভাবে এরকম গল্প বলা শিখল ? একদিন জানতে চেয়েছিল রিয়া। সুভাষজ্যেঠু বলেছিল, 'আমার ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি। গল্পের খনির মালিক ছিল বোধহয় ঠাকুমা। কখনও গল্প ফুরোত না। কত গল্প শুনেছি হিসেব নেই। অনেক প্রিয় গল্প বারবার শুনেও আশ মিটতো না। ঠাকুমার কাছে শোনা কিছু গল্প আমার মনে আছে এখনও। তোদের বলেছি। ঠাকুমার মতো করে বলতে পারিনি। তবে চেষ্টা করেছি। তোরা কতটা মজা পাচ্ছিস জানি না।'

সুভাষজ্যেঠু গল্প লেখে। তা সকলে পড়ে। নিজের লেখা গল্প বলতে চায় না। নতুন নতুন গল্প বানিয়ে শোনায় ছোটোদের। তারা কেউ বোঝে। কেউ বোঝে না। কেমন এক ঘোর আর ভালোলাগা কাজ করে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' কবে প্রকাশিত হয়? ওই উপন্যাসের একটি চরিত্রের নাম দেওয়া হয় এমন একজনকে যাঁর ওই বছরেই জন্ম। চরিত্রের নাম? তাঁর নাম?

২. রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' কবে প্রকাশিত? অমলের ভূমিকায় কে অভিনয় করেন?

৩. ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কবে প্রকাশিত? অনুবাদক কে? প্রকাশক?

৪. রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর নাম কি? কবে প্রকাশিত?

৫. 'রাজা রামমোহন' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? কবে মুক্তি পায়? নামভূমিকায় কে অভিনয় করেন?

উত্তর :১. ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। তাতা। সুকুমার রায়। ২. ১৬ জানুয়ারি ১৯১২। আশামুকুল দাশ। ৩. ১৯১২-এর নভেম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথ ইন্ডিয়া সোসাইটি, লন্ডন। ৪. জীবনস্মৃতি। ২৫ জুলাই ১৯১২। ৫. বিজয় বসু। ১ অক্টোবর ১৯৬৫। বসন্ত চৌধুরী।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

সম্পাদক মশাই বলেন 'আমার কাছে যে আসতে চায় আসতে দেবেন। বাধা দেবেন না।' সেদিন কবি চন্দ্রকান্ত নাগ সম্পাদকের কাছে হাজির। সম্পাদককে বললেন, 'একটা কবিতা লিখেছি। পড়ে শোনাই। একটু বড়ো কবিতা।' কবিতা পড়তে পড়তে কবি কখনও ঝুঁকে, নাচতে, ঘুরতে লাগলেন। এই সুযোগে সম্পাদক ঘুমিয়ে নিলেন। কবিতা পাঠ থামল এক ঘণ্টা বাদে। কবি চন্দ্রকান্ত বললেন, 'কেমন লাগল কবিতা?' সম্পাদক বললেন, 'আমাদের মেশিনে ছাপতে গেলে মেশিন ভেঙে যাবে।'

।। ২।।

পাঁচ বছরের গার্গী নামকরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে গেছে মা-বাবার সঙ্গে। ছোটোদের নানারকম প্রশ্ন করা হচ্ছে। তারা উত্তর দিতে না পারলে বলা হচ্ছে, 'আপনাদের মেয়ে এখনও তৈরি হয়নি।' দুচারজন বলছে, 'আসলে ছাঁটাই করার কৌশল এটা।' গার্গীকে প্রথম প্রশ্ন করা হলো, 'তোমার নামের মানে কি? সে জবাব দিল, 'নাম আমি রাখিনি। যারা রেখেছে তারা একটু বড়ো হলে বলে দেবে যখন মানে বুঝতে পারবো।' যিনি প্রশ্ন করছিলেন তিনি অবাক। পরের প্রশ্ন, 'গীতা কি?' গার্গীর উত্তর তৎক্ষণাৎ, 'গীতা একটি লাল বই, ঠাকুমা পড়ে।' গার্গীকে স্কুলে ভর্তি না করে উপায় ছিল না।

রামগরুড় সংকলিত

মা ও শিশুর মনের কথা

অঙ্গনা

মিতা রায়

একটি শিশু মায়ের কোলেই বেড়ে ওঠে। মায়ের গায়ের গন্ধ স্পর্শ তাকে ভরসা দেয়, তিলে তিলে বড় করে তুলতে সাহায্য করে। মা-ও তাঁর দুগ্ধ দিয়ে কোলের শিশুকে বুকের কাছে আঁচলের তলায় আঁকড়ে ধরেন; তার শরীরে কোনও আঁচড় লাগতে না পারে, সেদিকে থাকে মায়ের স্নেহভরা দৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠা শিশুটির মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। চোখ খুলে পৃথিবীটা চিনতে শেখে। মায়ের কোল ছেড়ে তখন সে মাটিতে পা রেখে আরও পাঁচজনের কাছাকাছি যেতে পারে। মনের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটতে থাকে। মা-ও তার বেড়ে ওঠা সন্তানকে তাঁর মনের মতো করে বড় করে তুলতে চান। সন্তানকে নিজে হাতে সবকিছু করে দিতে চান মা। তার কষ্ট, তার পরিশ্রম মা সহ্য করতে পারেন না। সন্তানের দেহে কোথাও লাগলে মার বুকেও যে ব্যথা লাগে। এই স্তরে এসে সন্তানের আবদার থাকে মায়ের কাছে তাকে খেলতে যেতে দেবার, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়ার, টিভি দেখতে দেওয়ার। আবার অন্যদিকে মা চান সন্তানকে চোখে চোখে রাখতে। তাই তিনি চান না সন্তানকে কোথাও যেতে দিতে,— যদি পড়ে যায়, যদি কেউ গায়ে ধুলো দেয়। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না, যদি তারা মা'র পছন্দের না হয়। টিভি দেখতে দেবেন না, কারণ পড়াশোনা করতে হবে বলে। এই শিশুর সব আবদারেই মায়ের 'না'— ধীরে ধীরে সন্তানকে স্বাভাবিকের পরিবর্তে অস্বাভাবিকতার পথে ঠেলে দেয়। সন্তান-মার ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্কে চিড় ধরে। সন্তান মাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। মা মনে করেন, তাঁর সন্তান তাঁর অমতে কাজ করছে। এখানেই ধীরে ধীরে মা-সন্তানের মধ্যে 'সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম' শুরু হয়। অতি সচেতন মা'দের সন্তানেরা আর পাঁচজন ছেলেমেয়ের মতো সহজ স্বাভাবিক হতে পারে না। তার চাহিদার বিরুদ্ধে সর্বদাই মায়ের চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে তার ভাল লাগে না। তখনই সে হাঁপিয়ে ওঠে। ফলে কিছুটা বড় হলেই পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। পড়াশোনায় সন্তানের

'দ্য বেস্ট' হওয়ার আশা থাকে মায়ের। কিন্তু তা পূরণ করতে না পারলে সন্তানের মধ্যে পলায়নপর মনোবৃত্তি কাজ করে। এমন কি সুন্দর পৃথিবীর রঙ-রস উপলব্ধি করার আগেই নিজেকে শেষ করে দেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে সন্তান কৃতী প্রতিষ্ঠিত হলেও বিবাহিত জীবনে সহজ হতে পারে না, কারণ মা তাকে সারাজীবন পরিচালিত করে চলেছেন। ফলে যে বসন্ত জীবনে আনে মধুর আনন্দ, তা নিরানন্দে পরিণত হয়। স্ত্রীর কাছে সে সহজ হয় না। সুতরাং, মা সন্তানের মনের কথা শুনুন, বন্ধুর মতো মিশুন। তবেই তো সন্তান সহজ হতে পারবে। সে যা চায়, তার মনের ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দিন পেছনে থেকে, তাকে উৎসাহিত করুন। মার কাছেই সন্তান সহজ হয়, ভরসা পায় এবং তাঁর সাহচর্য সাহসে ভর করে জীবনের পথে এগিয়ে চলে। আমাদের দেশের মহীয়সী নারীরাই আদর্শ মা হতে পেরেছেন, তাঁদের নৈতিক শিক্ষায় সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে দেশের-দশের বীর সাহসী আদর্শ সন্তান করে তুলেছেন। সেইসব কৃতী সন্তানদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল মাতৃভক্তি। অথচ সেইসব মায়েরা ছিলেন অন্দরমহলের বাসিন্দা, কখনও বা অক্ষরজ্ঞান শূন্য।

অর্থাৎ বাস্তবে আজকের মায়েরা অনেক বেশি শিক্ষিত। সন্তানও একটি বা দুটি। সুতরাং তাঁদের শিক্ষার প্রভাব সন্তানের ওপর অনেক বেশি আলোকপাত করবে, এটাই আশা করা যায়। কিন্তু ঘটছে তার উল্টো। মা-সন্তানের মধ্যে দূরত্ব ঘটছে। বড় হয়ে মায়ের থেকে সন্তানেরা দূরে চলে যাচ্ছে। মাতৃভক্তির টান আর সেভাবে দেখা যায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে মা-সন্তানের সম্পর্ক বোঝাপড়ার হোক, বন্ধুত্বপূর্ণ হোক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের মোড়কে আবদ্ধ হোক।

সিঙ্গুর ফল টক !

প্রিয়তমা সিঙুর,

কেমন আছ? আজকাল তুমি আর তেমন খবরে নেই। দিন দিন আড়ালে চলে যাচ্ছ। শুনেছি, হারানো সম্মান ফিরে পেতে আজকাল ঘন ঘন তোমায় সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয়। কলকাতায় হাইকোর্ট পাড়ায় শেষবার দেখা হয়েছিল। দু'টাকা কেজি চাল খেয়ে বেশ নাদুস নুদুস চেহারা হয়েছে দেখলাম। তবে মুখটা ফ্যাকাসে লেগেছিল। মাথাটা নিচু করে হাঁটছিলে। তার মধ্যেই দেখেছি মুখটা কেমন রক্ত শূন্য ফ্যাকাশে। ছত্রধর মাহাতোর বউটার মতো।

জানি, বর্ধিষ্ণু চাষি পরিবারের মেয়ে তুমি। চকচকে জীবন না হলেও অভাব ছিল না কোনওকালে। তোমার বাপ দাদাদেরও দেখেছি বুক উঁচিয়ে হাঁটতে। তোমারও ঠমক কম ছিল না। থাকবে নাই বা কেন? বছরে বার চারেক চাষে যা উঠত তা দিয়ে তোমাদের পরিবারে কখনও ভাত তরকারির অভাব হয়নি। গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছও ছিল। কোনওকালে কারও কাছে হাত পাততে হয়নি। সেই পরিবারের মেয়ে সিঙুর তোমাকে এখন সরকারের দয়ার দান মাসোহারা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। দু'টাকা কেজি ভিক্ষের চালে পেট ভরাতে হয়। দেমাকে তো লাগবেই।

ভাই সিঙ্গুর, 'সেলেব' হাওয়ার ওই হলো অসুবিধে। যতদিন গতর আছে, ততদিন দাম আছে। তোমরা মতো জীবন এই বাংলায় কম মেয়ের হয়নি। কত মেয়ে আলোর মুখ দেখতে গিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেছে। তারা কেউ অভিনেত্রী হতে প্রযোজক, পরিচালকের অঙ্কশায়িনী হয়েছে। কেউ মডেল হতে গ্ল্যামার দুনিয়ার সঙ্গে আপোষ করেছে। লাট সাহেবের বেগম হতে কালি মেখেছে মুখে, হাতে। শেষে কিস্যু না পেয়ে রাস্তায় এসে বসেছে। না, ভাই তোমায় তাদের সঙ্গে তুলনা করছি না। কারণ, আমি জানি তুমি অত স্বপ্ন দেখতে চাওনি। তোমায় জোর করে বণিকের হাতে তুলে দিয়েছেন তোমারই অভিভাবক। তোমাকে কাদায় নামিয়েছেন সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, সাদা চুলের অভিভাবক। স্বপ্ন দেখিয়েছেন কখনও আবোল-তাবোল বুঝিয়ে। কখনও জোর করে।

তারপর তোমার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে সেই বণিক গাড়িবাবু। বহু ফসলা তোমাকে বন্ধ্যা করেছে। সুখ, সম্মান, স্বস্তিতে থাকা সিঙুর, তোমাকে পথে বসিয়ে একদিন টাটা করে হাঁটা ধরেছে সেই রত্ন। তোমার সাদা চুলের অভিভাবক চুপ করে থেকেছেন।

কিন্তু সেই গাড়িবাবুও কি সত্যিই দায়ী? মনে কী ছিল জানি না, তবে সেও মুখে বলেছিল, সুখে রাখবে, যত্নে রাখবে। হাতে কানে গলায় ভরিয়ে দেবে অলঙ্কার। তোমার নামের সঙ্গে জুড়ে দেবে ন্যানোর অহঙ্কার।

তবে সেসব হলেও তোমার দেমাক যে খুব বেশি থাকত তা নয়। তোমার বাড়ির ছেলেপুলেরা চাকরি-বাকরি পেত এমনটা নয়। তখন হয়তো তোমার বাড়ির মেয়ে ঝিয়েরা বাবুদের বাড়িতে কাজ পেত। দু'টাকা কেজির চালের বদলে বাসি ভাত পেত। সঙ্গে মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা, টকে যাওয়া তরকারি।

কিন্তু সেই পরিণতিটাও হয়নি। আসলে কপাল যখন মন্দ হয় তখন ভাল মন্দ ঠাওর করা যায় না। এবার তুমি ধরা দিলে মায়া মমতার জালে। সিঙুর, তোমাকে দু'টুকরো করা হল। একটার নাম হলো চারশো একর। বাকিটা ছ'শো। তোমার সঙ্গে তোমারই লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া হলো। চারশো বনাম ছ'শো। সাদা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবিকে পাশে নিয়ে সেই লড়াই থামাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন স্বয়ং গোপাল ঠাকুর। কিন্তু রাজভবনেও রাজনীতির চার হাত এক হলো না।

সেই রাজনীতিই তোমাকে রাজপথে নামাল সিঙুর। ধর্মতলার পথে শুয়ে রইলে তুমি। দিন গেল, রাত গেল। নাচ, গান, মিছিল, মোমবাতি সব হল তোমাকে মাঝ রাস্তায় উলঙ্গ ফেলে। হাততালি উঠল। আবির উড়ল। পথে শুয়ে শুয়ে তুমি একের পর এক ভোট জিতলে। পঞ্চায়েত, লোকসভা, পুরসভা, বিধানসভা। সরকারও গড়লে।

ততদিনে তোমার নাম হয়ে গেছে মা-মাটি-মানুষ। তাপসীকে হারিয়েও আবার কবে তুমি মা হলে, জানতেও পারলে না। বহু অত্যাচারে লাঞ্ছিত তোমার মা ভারত খণ্ডিত হয়েও যেমন মধ্যরাতে স্বাধীন হয়েছিল ঠিক তেমনই তোমার স্বাধীনতার ঘোষণা হল এক শপথ দিবসের মধ্যরাতে। তোমার সব কলঙ্ক নাকি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে এবার। আবার নাকি, তোমার বুকের দুধ আর মধু নিয়ে পুরুষ্টু ধান জন্ম নেবে।

আইন হলো। আদালতও হলো। এতদিন বন্দি থাকলেও তোমার হাত দুটো ছিল খোলা। এবার শৃঙ্খল পড়ল। আইনের হাই শৃঙ্খল থেকে ক্রমে সুপ্রিম শৃঙ্খল।

সিঙুর, একদিন হয়তো সে শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে তুমি। কিন্তু বণিকবাবুর নখের দাগ কি মিটবে তোমার গা থেকে? তোমাব বুকে কি আর কোনদিন জেগে উঠবে যুবতী ধান? ক্ষত বোজানো ক্ষেতে কি আর কখনও ঢেউ খেলে যাবে বাতাস? জানিনা, বালি কাঁকর সিমেন্ট মেশানো ওই শিল্প জমিতে কোনওদিন কোনও বন্যা কৃষি হওয়ার মতো পলি এনে দিতে পারবে কিনা। জানিনা, কোনওদিন কোনও লাঙলের ফলা ওই বন্ধ্যা পাথুরে জমিকে চিরে উর্বর করে দিতে পারবে কিনা।

ততদিন ওই সরকারি দান, সরকারি চাল নিয়েই খুশি থাকো সিঙুর।

গাড়িবাবু অনেকদিন আগেই অন্য ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। তবু তোমাকে ওঁর বাগদত্তা ঠাউরে অধিকার ছাড়তে রাজি নন এখনও। আর একটা কথা শুনলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। তবু বলি, তোমার দাদা ধুতি কিংবা সাদা শাড়ির গার্জিয়ানরাও কিন্তু এখন বলতে শুরু করেছেন, সিঙুর ফল টক। তাঁরাও এখন উন্নততর ফলের খোঁজে।

— **সুন্দর মৌলিক**

সি বি আইকে স্বাধীনভাবে শ্বাস ফেলতে দেওয়া হোক

অতিথি কলম

অরিন্দম চৌধুরী

ইউ পি এ-এর বিভিন্ন সংকটের সময়ে তাদের পাশে মুলায়ম ও মায়াবতীকে দেখে আপনারা কি কখনও অবাক হয়েছেন? অথবা ডি এম কে প্রধান চরম হেনস্থা সত্ত্বেও ইউ পি এ-কে কেন ছেড়ে যাননি? কিংবা কীভাবে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ইউ পি এ রাজত্ব করে চলেছে? এসবেরই উত্তর রয়েছে সরকারের সি বি আইয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সময় সময় তার সুবিধা মতো প্রয়োগ। সি বি আই-কে দিয়ে এঁদের কাজকর্মের তদন্ত করার ভয় দেখিয়ে সমর্থন আদায় করছে ইউ পি এ তথা কংগ্রেস। সিবিআই ইউপিএ সরকারের তুরূপের তাস। সবচেয়ে বড় কথা হলো এইসব নেতা-নেত্রী সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, ব্যতিক্রম শুধু নেত্রী মমতা। আর এঁদের এই অপরাধের জন্যই এঁদের ব্ল্যাকমেল করছে কংগ্রেস।

সব থেকে মাথাব্যথার কারণ অন্ধ্রের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডি। তাকে দিয়ে বিষয়টা শুরু করা যেতে পারে। তার অভিযোগ— রাজ্যে কংগ্রেস সি বি আই-কে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক বিরোধিতার কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। সাক্ষী টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক শ্রীমতী ওয়াই এস রেড্ডি, মি. রেড্ডির স্ত্রী। তাঁর নিজস্ব চ্যানেলে এক ঘণ্টা অনুষ্ঠানে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া ও তাঁর পুত্র রাহুলের সমালোচনা করায় রেড্ডি-র পিছনে সিবিআই-কে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ রেড্ডির বিরুদ্ধে সিবিআই আদালতে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধারায় আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মামলা দায়ের করেছে। সমস্ত ধরনের সরকারী বিজ্ঞাপন 'সাক্ষী চ্যানেলের' জন্য বন্ধ।

একই ঘটনা উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ২০০৭ সালে তাজ হেরিটেজ করিডর মামলায় আদালতে ক্লিনচিট পাবার পর থেকেই মায়াবতী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, ইউ পি এ থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার জন্য সরকার সি বি আই-কে কাজে লাগিয়ে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি মামলায় তাঁকে হেনস্থা করেছে প্রতিশোধ তুলতে।

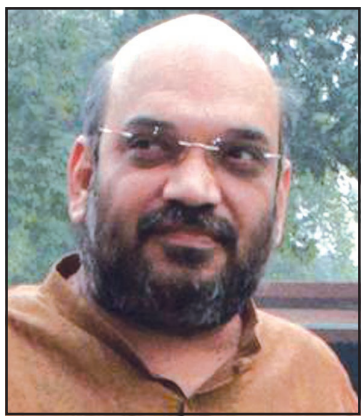

বর্তমান গুজরাট সরকারকে হেনস্থা করতে সোহ্‌রাবউদ্দিন মামলা তদন্ত করতে সি বি আই-কে নামিয়েছে কেন্দ্র এবং সি বি আই-কে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। ... আই পি এস অফিসার গীতা জোহ্‌রি ২০১০ সালে সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁকে চাপ দিয়ে সোহ্‌রাবউদ্দিন হত্যা মামলার তদন্তে তৎকালীন গুজরাট মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে।

একইভাবে বর্তমান গুজরাট সরকারকে হেনস্থা করতে সোহ্‌রাবউদ্দিন মামলা তদন্ত করতে সি বি আই-কে নামিয়েছে কেন্দ্র এবং সি বি আই-কে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে 'স্টিং অপারেশন'ও স্পষ্টতঃ দুরভিসন্ধিমূলক। এমনকি আই পি এস অফিসার গীতা জোহ্‌রি ২০১০ সালে সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁকে চাপ দিয়ে সোহ্‌রাবউদ্দিন হত্যা মামলার তদন্তে তৎকালীন গুজরাট মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে সরকারের বিরুদ্ধে মামলাগুলি লঘু করে দেখানোর জন্য সি বি আই-কে সরকার ব্যবহার করছে। ১৯৮৪ সালের শিখ নিধন মামলায় সি বি আই তার চার্জশীটে বলেছে যে, জনৈক যশবীর সিং সম্ভবতঃ কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলারকে শিখ নিধনে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলতে শুনেছে। কিন্তু সি বি আই ওই যশবীর সিংকে আজ পর্যন্ত সন্ধান পায়নি। কিন্তু সি বি আই-র ওই দাবি মিডিয়া নস্যাৎ করে দিয়েছে যখন মিডিয়া যশবীরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে।

এতসবের পর আদালত যখন পুনর্তদন্তের নির্দেশ দেয় তখন সি বি আই-এর সাফাই হলো মি. সিং-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তাই মামলা বন্ধ করা হোক। পুরো ব্যাপারটা হলো টাইটলারকে বাঁচানো, কারণ টাইটলার আজও কংগ্রেস নেতা এবং সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

আবার সজ্জন সিং-কে বাঁচাতেও সি বি

আই তৎপর। কারণ সেও ইউ পি এ-র সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। বিস্ময়ের বিষয় হলো হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ৫৭০০ কোটি টাকার এন আর এইচ এম দুর্নীতি মামলায় উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সি বি আই প্রায় কিছুই করেনি। অথচ রাজ্যে মায়াবতীর ভরাডুবির পর তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে মামলা বন্ধ করে দেয় সি বি আই। বিনিময়ে পর্যুদস্ত নেত্রী উত্তরাখণ্ডে নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করেন আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের আশ্বাস দেন।

এই সমস্ত মামলাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সরকার যথেচ্ছ ভাবে সি বি আই-কে ব্যবহার করছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কখনও কাউকে ইচ্ছেমত কাঠগলায় দাঁড় করাচ্ছে আবার কোনও অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দিচ্ছে। যেহেতু সি বি আই-র শীর্ষে একজন আমলা যিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে দায়বদ্ধ, তাই এজেন্সিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা সহজ। সি বি আই একটি স্বাধীনসংস্থা এবং রাজনীতিক নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে এটাই দস্তুর। তবুও ঠিক বিপরীত কাজই করছে এই সংস্থাটি এবং তা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের চাপেই।

সি বি আই স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালের এপ্রিলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ব্যুরো পরিচালনার জন্য কোনও আইন তৈরি হয়নি। পরিবর্তে সংস্থাটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুরাতন 'Delhi Special Police Established Act'— বিধিমতে, যে আইনটির খোলনলচে বদলানো এখনই দরকার। তৎসত্ত্বেও সি বি আই ইতিমধ্যে 'Central Bureau Act 2010' নামে একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে যাতে সংস্থাটি DSPE Act থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ২০০৬ সালের নভেম্বরে তদানীন্তন সি বি আই অধিকর্তা বি. আর. লাল তাঁর লেখা সরকারি পত্রে উল্লেখ করেছেন কীভাবে রাজনৈতিক নেতাদের চাপের মধ্যে সংস্থাকে কাজ করতে হয়। অন্য আরেক অধিকর্তা যোগিন্দার সিংহও সংস্থার কাজকর্মের নিন্দায় মুখর। মি. এন কে সিং নামে অপর এক অতিরিক্ত সি বি আই অধিকর্তাও দাবি করেছেন যে তদন্তকারী সংস্থাটি রাজনীতি দখলমুক্ত হোক।

যখন কোনও সংস্থার মাধ্যমে অনৈতিক কাজকর্ম করা হয় তখন সেই সংস্থাটি নিজের জন্যও অনৈতিক কাজ করতে চাইবে। আর টি আই কর্মী মনীশ ভাটনগরের অভিযোগ যে, তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে তিনি যখন সি বি আই অধিকর্তার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে চান তখনই তাঁর পিছনে লেগে যায় সংস্থাটি এবং এখন তথ্য জানার অধিকার আইন থেকে সি বি আই-কে রেহাই দিয়েছে ক্যাবিনেট।

এইসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সি বি আই-ও এক সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে গণ্য হোক যেমনটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং সি এ জি। এদের সততা আজ চর্চার বিষয় এবং দুর্নীতি দূরীকরণে এদের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য। অথচ সি বি আই-এর ভূমিকা অস্পষ্ট এবং দুর্নীতির সহায়ক হিসাবে আজ সর্বত্র চর্চিত। □

(শ্রী অরিন্দম চৌধুরী একজন ম্যানেজমেন্ট গুরু এবং সাম্মানিক অধিকর্তা আই আই পি এম-র।)

নেত্রদান মহাদান

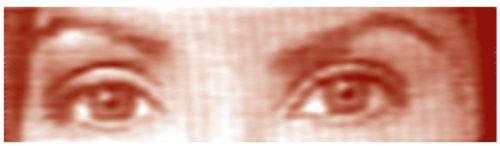

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

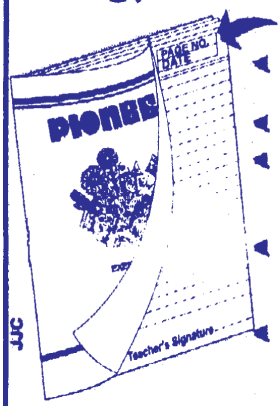

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

গোত্রহীন আমলা থেকে কেলেঙ্কারি উদ্‌ঘাটনের পুরোধা

বিনোদ রাই

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাত্র কয়েক বছর আগেও রাজধানী দিল্লীর সরকারি মহলে নিতান্তই এক গড়পড়তা আমলা ছিলেন তিনি। কিন্তু ২০০৮ সালে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) পদের কার্যভার গ্রহণ করার পরেই ছবি বদলে গেছে। বরাবর নাম কে ওয়াস্তে চলতে থাকা বিভাগটিকে (ক্যাগ) দুর্নীতি আর টাকা তছরূপ সনাক্ত করার ধারালো হাতিয়ার হিসেবে অধুনা প্রয়োগ করেছেন তিনি।

কথাটিকে সত্য প্রমাণ করে গত ১৭ আগস্ট ৬৪ বছর বয়স্ক বিনোদ রাই নামের এই মুখ্য অধিকর্তা তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে কয়লার ব্লক বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারের চূড়ান্ত বেনিয়মের ব্যাপারটি ফাঁস করেছেন। 'কোলগেট' নামে কুখ্যাত বহু লক্ষ কোটি টাকার এই কেলেঙ্কারী ইতিমধ্যেই দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে।

সংবিধান স্বীকৃত ক্যাগ-এর প্রধান হিসেবে তাঁর এই চলতি কার্যকালের মধ্যে তিনি যে অসামান্য সাহসিকতায় বিশাল মাপের সব অর্থনৈতিক বেনিয়মের পর্দা ফাঁস করেছেন তার তুলনা স্বাধীনোত্তর ভারতে বিরল। স্বাভাবিক নিয়মেই শত্রুগোষ্ঠী তাঁর এই নির্ভীক কার্যকলাপকে অনধিকার চর্চা বা নীতি নির্ধারণে মাথা ঘামানোর মতো ব্যাপার বলে আখ্যা দিয়েছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলের তথ্য অনুযায়ী এক বরিষ্ঠ সংখ্যক কর্তাব্যক্তি অর্থনৈতিক দুর্নীতির এই বিস্ফোরক উন্মোচনে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২জি স্পেকট্রাম বিতরণের বেনিয়ম নিয়ে সরকার বিরাট ধাক্কা খাওয়ার ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী এ. রাজার চাকরি যায়। তাঁর জেলবাসও হয়েছে।

আদর্শ হাউসিং সোসাইটি ও কমনওয়েলথ গেমস নিয়ে তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে উঠে আসা নানান গরমিল ও অসঙ্গতি সরকারের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। এগুলিকে কেন্দ্র করেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষ প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করছে।

সমাজতত্ত্ববিদ দীপঙ্কর গুপ্তের অভিমত অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে এতগুলি কেলেঙ্কারীর ফাঁস হওয়ায় দেশবাসীর ক্যাগ দপ্তরের উপর মনোসংযোগ করেছে। শ্রীগুপ্ত বলেন, তাহলে এটা কি ধরে নেওয়া যায় ক্যাগ-এর জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যই এসব করা হচ্ছে? নাকি এতগুলো কেলেঙ্কারীর মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি নিজেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে? তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী 'আগেকার ক্যাগ রিপোর্টগুলি ছিল নির্বিষ ও বাজার চলতি। এতগুলি কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়ার ভিত্তিতে যথার্থই ক্যাগ সংবাদ শিরোনামে আসার যোগ্যতা পেয়েছে'।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী ক্যাগ দপ্তরে তাঁর সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, শ্রীরাই তাঁর আধিকারিকদের উপর আস্থা রাখেন। কখনই একা সব কিছুর ওপর লাঠি ঘোরান না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্যাগ দপ্তরের এক আধিকারিকের বয়ান অনুযায়ী অধিকর্তা রাই তাঁর অধীনস্থদের কাজ করার সুযোগ করে দেন। এর ফলে তাঁরাও স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা পান। অবশ্য আজকাল আর টি আই অ্যাক্টের মাধ্যমে নাগরিকদের খবরের ওপর অধিকার, সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংবাদ মাধ্যমগুলির সক্রিয়তায় সরকারি দপ্তরগুলিতে দায়বদ্ধতার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে ক্যাগ-এর কাজকম্মের উপরে নাগরিকদের আস্থা বাড়ছে।

মৃদু স্বভাবের এই আমলা কিন্তু সরকারের ভুল ত্রুটি নির্দেশ করার ব্যাপারে ক্ষুরধার। গত বছরই হায়দরাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমীর এক সভায় তিনি বলেন, 'প্রশাসনের ব্যাপারটা এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমাদের নৈতিক মান নিম্নগামী। সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় নেই বললেই হয়। আমার বক্তব্য অপ্রিয় শোনালেও এটাই কঠিন বাস্তব। আর এই কারণগুলির জন্যই সিদ্ধান্তহীনতার জন্ম হয়েছে।'

ব্যক্তিগত পরিচয়ে শ্রীবিনোদ রাই-এর জন্ম উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে। দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সের স্নাতকোত্তর ছাড়াও পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হার্ভাড বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে। ১৯৭২ সালের কেরল বর্গের এই আই এ এস অফিসার বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। উল্লেখ্য, ক্যাগ-তে যোগ দেওয়ার আগে অর্থ দপ্তরের মঞ্জুরীকৃত 'কৃষিঋণ মকুবের' ভাবনাও ওই দপ্তরের আমলা হিসেবে তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

অখিলেশের রাজত্বে আড়াই মাসে পাঁচবার দাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের মুখ্যমন্ত্রীত্বের এখনও এক বছরও পুরো হয়নি। এর মধ্যে আড়াই মাসেই পরপর ৫টা দাঙ্গা ঘটে গেছে। ৭ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশকর্মীও রয়েছেন। বেরিলিতে এক মাসের মধ্যে দু'বার দাঙ্গা হয়েছে। মথুরা এবং এলাহাবাদে কারফিউ জারি করতে হয়। দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ১০৮ জনের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে। প্রিভেনটিভ ডিটেনশান ধারায় ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও পুলিশ এখনও চার্জশীট দাখিল করতে পারেনি। পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে বলে শুধু দাবী করা হয়েছে।

নতুন সমাজবাদী পার্টি সরকারের আমলে প্রথম দাঙ্গা শুরু হয় ১ জুন মথুরায়। মথুরার কোসি কালান এলাকায় এক ধর্মীয় স্থানের কাছে জল নিয়ে প্রথমে বচসা ও পরে হিংসাত্মক আকার নেয়। দাঙ্গায় ৪ জন নিহত হয়। এরপর এক দলিত বালিকাকে গণধর্ষণ ও হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপগড়ের কাছে আস্থান গ্রামে দাঙ্গা শুরু হয়। নির্যাতিত মেয়েটিকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখনই দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর।

একই সময়ে বেরিলিতে কানওয়ারিয়াস (Kanwarias) ও এক চায়ের দোকানদারের সঙ্গে বিবাদকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয়। ৩ জন মারা যায়। নতুন করে বেরিলিতে আবার দাঙ্গা শুরু হয় ১১ আগস্ট। বেরিলির শ্যামগঞ্জ ও জগৎপুর এলাকার ক্রসিং-এ একটি ধর্মীয় মিছিলের উপরে পাথর ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয়। কার্ফু জারি হয়।

সাম্প্রতিক শেষ দাঙ্গাটি হয়েছে এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতে। অসম ও মায়ানমারে মুসলিম হত্যার প্রতিবাদে জমায়েত থেকে গাড়ী ভাঙচুর, পথচারী ও দোকান লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া, সাংবাদিকদের মারধোর শুরু হয়। লক্ষ্ণৌ-এর বুদ্ধ পার্কেও ভাঙচুর চালানো হয়।

গত ২০ আগষ্ট লক্ষ্ণৌ-এ আইসবাগ ঈদগা-য় ঈদের শুভেচ্ছায় অখিলেশ।

দাঙ্গাকারীদের ছবি হাতে এলেও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ খুব সতর্কভাবে এগোচ্ছে। কেননা সমাজবাদী পার্টির রাজ্যে ক্ষমতালাভের পেছনে যে মুসলিম ব্লক ভোট কাজ করেছে এটা কারও অবিদিত নয়।

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

□ □ □ □ □

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মালদায় মা কালীর বেদী ভেঙ্গে ওয়াকফ বোর্ডের অফিস নির্মাণের চেষ্টা

সংবাদদাতা।। মালদা শহরে মা কালীর প্রাচীন বেদী ভেঙে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংখ্যালঘু দপ্তরের এবং ওয়াকফ বোর্ডের অফিস ও মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদহ রক্ষাকালী মন্দির কমিটি প্রশাসনের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

মালদহের জেলাশাসকের বাংলোর পশ্চিমদিকে একটি স্থান আছে। যার বিবরণ হলো— স্থানটির মৌজা ইংরেজ বাজার। জে এল নং ৬৭ এবং দাগ নং ১২২৯ এবং ১২৩০। এই দুটি দাগের ১২২৯ দাগে ৯ শতক জমি হচ্ছে জাহান পীরের মাজার আর ১২৩০ দাগের ৯ শতক জমিতে অবস্থিত মা কালীমাতার প্রাচীন বেদী। এই স্থানটি বি জি রোডের পশ্চিমদিকে ও বি টি কলেজের পূর্বদিকে। দুই দাগের মধ্য দিয়ে বি টি কলেজে ঢোকার প্রাচীন রাস্তা যা বর্তমানেও আছে। বহু বছর ধরে এই বেদীতে যেমন মা কালীর পুজো করেন হিন্দুরা, জাহান পীরের মাজারে তেমনিভাবে শ্রদ্ধা জানায় মুসলমান-হিন্দু উভয়েই। উপরের দুটি দাগের জমিই ভেস্ট। বর্তমানে এল আর পরচায় মা কালীর বেদী থাকা সত্ত্বেও দুটি দাগকে এক করে যে সমস্ত সরকারী অফিসার জাহানপীরের মাজারের নামে অন্যায়ভাবে পুরো জায়গা রেকর্ড করার সুপারিশ ও ব্যবস্থা করেছেন এবং সংখ্যালঘু দপ্তরের জন্য পাঁচতলা বিল্ডিং-এর প্ল্যান পাস করেছেন, তাদের শাস্তির দাবি উঠেছে। প্রশ্ন উঠছে, মালদা সদর হাসপাতালের মধ্যে নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ হওয়া সত্ত্বেও তবে সেখানকার মাজার ভাঙ্গা হলো না কেন? সেরকম এখানেও সংখ্যালঘু দপ্তরের অফিস নির্মাণের জন্য মা কালীমাতার বেদী ভাঙ্গা যাবে না বলে দাবি উঠেছে।

জাহানপীরের মাজার ঠিক থাকবে আর শুধু ভেঙ্গে ফেলা হবে প্রাচীনকালের মা-কালীমাতার বেদীটি যেখানে আজও পুজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় এবং হচ্ছে--- একে

সরকারের সংখ্যালঘু তোষণ নীতির অঙ্গ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। যে বেদীকে ঘিরে বহু বছর ধরে হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশ্রিত হয়ে এক সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছিল তা গত ১২ আগস্ট (২০১২) রাত্রে পুরপ্রধানের উপস্থিতিতে এবং তাঁর নির্দেশে ইংরেজ বাজার পৌরসভা ভেঙ্গে ফেলেছে। এবং সেদিন মা-কালীর শেড ভেঙ্গে ফেলে উপরের ছাদের টিন ইংরেজ বাজার পৌরসভা নিয়ে গেছে। অথচ মাজার পুরোপুরি অক্ষত আছে।

মালদা শহরের শান্ত পরিবেশ এই ধরনের কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি দেখিয়ে হিন্দুদের প্রাচীন কালী বেদী ভেঙ্গে সংখ্যালঘু দপ্তরের কার্যালয় বানানোর পরিস্থিতি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের ভাবাবেগকে আহত করছে। গত তিন মাস ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিয়ে ওই কার্যে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছে। স্থানীয় এলাকার অসংখ্য মানুষজন ডেপুটেশনে সই করে জেলাশাসককে একই দাবী জানিয়েছেন।

এখনও প্রশাসন তার নিজের পথে চলছে। এনিয়ে তাই মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। সংখ্যালঘু দপ্তরের অফিস কালীমাতার বেদী ভেঙ্গে যেন না হয় এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর। হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতেও সরকার দায়বদ্ধ। জেলাশাসক গত ১০ আগস্ট ডেপুটেশন দেওয়ার সময় সে কথা স্বীকারও করেছিলেন। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন— (১) প্রাচীন মা কালী বেদী বর্তমানেও যা পূজিত হয়ে আসছে তার অবস্থান সত্ত্বেও কি কোনও খাস জমি ওয়াকফ বোর্ডকে দেওয়া যায়?

(২) ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে কি কখনও মা-কালীর মন্দির থাকতে পারে?

(৩) যে সমস্ত অফিসার কালীমন্দির থাকা সত্ত্বেও খাসজমি ওয়াকফকে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন তাদের এবং যে সমস্ত অফিসার পাঁচতলা গৃহ নির্মাণের প্ল্যান পাশের সুপারিশ করেছেন, তাদের শাস্তি হবে না কেন?

(৪) ১২৩০ দাগের পুরো জমি মাকালী মন্দিরের নামে 'ইজমেন্ট রাইট বলে' রেকর্ড কেন করা হবে না?

শেষ খবর, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজের প্রবল প্রতিরোধে প্রশাসন পিছু হটেছে। মন্দিরে হিন্দুরা পূজার্চনা করছেন। পূজার্চনা চলবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। ▯

দ্রোণাচার্য

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর বিকানীরের লাগোয়া শহরতলিতে একটি ছোট্ট মনোরম জায়গা শিববাড়ি। নামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেখানকার শিবমন্দিরের নামডাক খুব। ভোর থেকে ভেসে আসে প্রার্থনার শব্দ,

শ্যুটিং রেঞ্জে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ।

আরতির মিষ্টি আওয়াজ, কাঁসর-ঘণ্টার মনোরম ধ্বনি। আর পাঁচটা হিন্দু মন্দিরের থেকে একে আলাদা করা যাবে না কোনওমতেই। তবে যাঁরা খুব ভোরে ওঠেন তাঁদের এহেন শব্দে ঘুম ভাঙতে পারে। কিন্তু যাঁরা লেট রাইজার তাঁদের ঘুম ভাঙে গুলির শব্দে। না না, একদম ঘাবড়ে যাবেন না! খুন-খারাপি-র কথা মাথাতেই আনবেন না। বরং ভয় কাটাতে মুখ-শুদ্ধি হিসেবে ভুজিয়া খেয়ে নিতে পারেন সাত সকালেই, যদি কস্মিনকালে বিকানীর যান। শিববাড়ির ভুজিয়া কিন্তু খুব বিখ্যাত। যাইহোক খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তমনে মন্দির চত্বরে পৌঁছে চোখ-টোখ কচলে তাকিয়ে দেখবেন গেরুয়াধারী সৌম্যকান্তি এক প্রবীণ সন্ন্যাসীকে। তাঁর নাম স্বামী ঈশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ। দেড়শ' বছরের প্রাচীন ধর্মস্থানের ষষ্ঠতম প্রধান তিনি। অভিনব বিন্দ্রা কিংবা হালফিলের গগন নারাং, জয়দীপ কর্মকারদের সৌজন্যে বন্দুক ছোঁড়া ব্যাপারটা ভারতবাসীদের কাছে আর ভীতিপ্রদ নয়, অলিম্পিক পদকের দৌলতে বরং প্রীতিপ্রদ।

বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই রাইফেল শ্যুটিং-এর শিক্ষা দিয়ে আসছেন ঈশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ। তাঁর শিক্ষায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পদকপ্রাপ্তদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্যুটার বিকানীরের শাসক প্রয়াত কারনি সিং-এর কন্যা ও জাতীয় সেরা রাজ্যশ্রী এবং এথেন্স অলিম্পিকে রূপো জয়ী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর এই ইন্ডোর শ্যুটিং রেঞ্জ-এরই ফসল। প্রসঙ্গত, দেশের মধ্যে এটাই একমাত্র জেলা যা ক্রীড়াক্ষেত্রে ৩টি অর্জুন সম্মানের ভাগীদার হয়েছে। পিতা-পুত্রী অর্থাৎ কারনি-রাজ্যশ্রী ছাড়াও রাজ্যবর্ধনও এই সম্মান আদায় করে নিয়েছেন।

সম্প্রতি দোহায় আয়োজিত দ্বাদশ আন্তর্জাতিক শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী মমতা শর্মা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন ঈশ্বরানন্দের কৃতিত্বকে। পাশাপাশি উল্লেখ করতে হয় ভাবনা শর্মার কথাও। দশ মিটার ইভেন্টে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এই শ্যুটিং রেঞ্জ-এরই আবিষ্কার। এই রেঞ্জ-এর নির্দেশক রমেশ শর্মার কাছে রয়েছে সুদীর্ঘ একটি তালিকা যাঁরা আন্তঃ স্কুল, আন্তঃকলেজ এবং আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় একের পর এক পদক জয় করেছেন। সকালে প্রার্থনার পর মহারাজ যিনি মন্দিরে অধিক পরিচিত সম্বিৎ সোমগিরি মহারাজ নামে, তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছে যান শ্যুটিং রেঞ্জে। প্রশিক্ষণ শুরু করার আগে সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ ও ধ্যান করান। কারণ হিসেবে বলছেন, মনসংযোগ-ই শ্যুটিং-এ সাফল্যের মূলমন্ত্র। তিনি নিজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৃতী ছাত্র। কিছুদিনের জন্য যোধপুরের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেটালার্জির (ধাতববিদ্যা) শিক্ষাও নিয়েছিলেন। তাই শ্যুটিংয়ের বিজ্ঞানটাও ভালই বোঝেন। আর বোঝেন বলেই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে হয়ে উঠতে পেরেছেন দ্রোণাচার্য। আক্ষরিক অর্থেই।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

যোগে রোগ মুক্তি

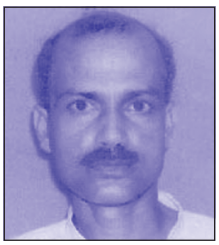

আশীষ পাল

প্রাণায়াম প্রক্রিয়া

প্রথম প্রক্রিয়া : ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম

প্রদ্ধতি : সুখাসনে/বজ্রাসনে/পদ্মাসনে/সিদ্ধাসনে যে কোনও একটিতে বসুন। আসনে বসে মেরুদণ্ড, মাথা, ঘাড় একসরল রেখাতে, আনুন। চোখ ও মুখ বন্ধ করে ঈশ্বরের প্রার্থনা যেমন ওম্ অথবা যে মূর্তিতে ভালোবাসেন কল্পনা করুন/প্রার্থনা করতে করতে দুই নাক দিয়ে মধ্য গতিতে লম্বা শ্বাস নিন শরীরের ভিতর ডায়াফ্রাম অবধি। যতক্ষণ শ্বাস শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল ঠিক ততক্ষণ সময় ধরে একইভাবে শরীরের ভিতরের শ্বাস বাহিরে বের করা। অর্থাৎ **দুই নাসারন্ধ্র থেকে শ্বাস নেওয়াকে বলে পূরক এবং শ্বাস ছাড়াকে বলে রেচক।** শ্বাস নেওয়ার সময় নাসারন্ধ্রে শীতল অনুভব এমনকী শুদ্ধ অক্সিজেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। শ্বাস ছাড়ার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড শরীরের মধ্যে থেকে বাহিরে নির্গত হচ্ছে অর্থাৎ শরীরের মধ্যের বর্জ্যপদার্থ বা দূষিত পদার্থ বাহির হচ্ছে অনুভব করা এমন কী তন্ময়তার সঙ্গে করা। মাত্র ৩ সেকেন্ডে শ্বাস নেওয়া এবং ৩ সেকেন্ড শ্বাস ছাড়া। লক্ষ্য রাখতে হবে পেট যেন না ফোলে শুধু বুক প্রসারিত হবে, পেট প্রয়োজনে ঢুকতে পারে। সতর্কতা— যাদের হার্টের বা ফুসফুসের কোনও অসুখ আছে কিম্বা বড় ধরনের অপারেশন করেছেন তাদের ধীর গতিতে এই প্রাণায়াম করা উচিত। ৩ থেকে ৫ মিনিট করা। গ্রীষ্মকালে কম করা উচিত।

উপকারিতা : সর্দি-কাশি, অ্যালার্জি, শ্বাস রোগ, হাঁপানি, সাইনাস ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের কফ রোগ দূর হয়। ফুসফুস শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রচুর অক্সিজেন প্রাপ্ত হওয়ার ফলে হৃদয় ও মস্তিষ্কের আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, গলার রোগ দূর হয়। এছাড়া প্রাণ ও মন স্থির হয়। এই প্রাণায়াম কুণ্ডলিনী জাগরণের সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া : কপালভাতি প্রাণায়াম

প্রদ্ধতি : কপাল+ভাতি=কপালভাতি। যে প্রাণায়াম করলে মস্তিষ্ক অর্থাৎ কপালে আভা কান্তি এবং তেজ বেড়ে ওঠে সেই প্রাণায়াম হচ্ছে কপালভাতি প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামে শুধুমাত্র শ্বাস ছাড়া অর্থাৎ রেচকের উপর জোর দেওয়া হয়। শ্বাসকে ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা না করা, শুধুমাত্র শ্বাসকে জোর দিয়ে শরীরের ভিতরের কার্বন ডাই অক্সাইডকে বাহিরে বের করা। সেই সময় পেট সংকোচন হবে (পেট ভিতরের দিকে ঢুকবে) অর্থাৎ পেট হাঁফরের মতো ঢুকবে আর বেরবে। অভ্যাসকারী মনে করবে পূর্ণ একাগ্রতায় শ্বাসকে যতটা সম্ভব বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া। তবে ভিতরের বাতাসকে বলা হচ্ছে তুমি বাইরে যতদূর পার ছুটে যাও। বাতাস ছাড়ার সময় অনুভব করা মূলাধারচক্র অর্থাৎ কন্দস্থান, স্বাধিষ্ঠান চক্র অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগ, মণিপুর চক্র অর্থাৎ নাভির কেন্দ্র কুঞ্চিত ও প্রসারিত হবে। কম করে ৩—৫ মিনিট অভ্যাস করা। প্রথম প্রথম বেশিক্ষণ করা উচিত নয়। বেশি করলে পেটে ব্যথা ও সর্দি ও জ্বর হতে পারে। মাত্রা ১ মিনিটে ৬০ বার করা হলো আদর্শ স্থিতি। সতর্কতা— যারা সদ্য সদ্য বাইপাস সার্জারী করেছেন তাদের করা উচিত নয়, যোগ্য শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।

উপকারিতা : মস্তিষ্ক এবং মুখমণ্ডলের কান্তি তেজ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পাচনতন্ত্র মজবুত হয়, সমস্ত প্রকারের কফ রোগ, হাঁপানী বা শ্বাসরোগ, অ্যালার্জি সাইনাস, মোটাপন (পেটের ভুঁড়ি), ডায়বেটিস গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল-পিত্ত, আমাশয়, কিডনি ইত্যাদি রোগ নিরাময় হয়। বিশেষ করে দুর্বলতন্ত্রগুলোকে সবল বানানোর জন্য সর্বোত্তম হলো এই প্রাণায়াম।

তৃতীয় প্রক্রিয়া : বাহ্য প্রাণায়াম

প্রদ্ধতি : লম্বা করে শ্বাস নিয়ে পুরো শ্বাস ছেড়ে দিন। এই শ্বাস ছাড়া অবস্থাটিকে বলা হয় বাহ্যকুম্ভক। অর্থাৎ ভিতরটা তখন সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য। এই অবস্থায় থেকে ক্রিয়া শুরু করুন। প্রথম ক্রিয়া থুতনিকে কণ্ঠনালিতে ঠেসে ধরুন— একে বলে জালন্ধর বন্ধ। তারপর মূলাধারকে সম্পূর্ণ ভিতর দিকে টেনে নিন এবং স্বাধিষ্ঠানকে সঙ্কুচিত করুন। অর্থাৎ মূলবন্ধ, উড্ডীয়মান ও জালন্ধর বন্ধ, একে বলা হয় মহাবন্ধ। বাহ্যকুম্ভক এবং মহাবন্ধ একসঙ্গে করে যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ থাকুন। যখন মনে হবে আর পারা যাচ্ছে না তখন বন্ধ ত্যাগ করে শ্বাস নিতে নিতে মাথা সোজা করুন তারপর শ্বাস ত্যাগ করুন। মাত্রা হলো প্রথমে তিনবার তারপর ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ৫ বার পর্যন্ত করতে পারেন। বিঃ দ্রঃ— গুরুমুখী বিদ্যা সঠিক ভাবে না করলে লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হবে। তাই যোগ্য শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে করা শ্রেয়।

উপকারিতা : এই প্রাণায়াম মনের চঞ্চলতা দূর হয়। ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। এই প্রাণায়াম পেটের বিশেষ উপকারী হয়। বুদ্ধি সূক্ষ্ম এবং তীব্র হয়ে ওঠে। এছাড়া শরীরের শোধন করে বীর্যকে ঊর্ধ্বগামী করে তুলে, ফলে স্বপ্নদোষ, শীঘ্রপতন ইত্যাদি ধাতু বিকারের নিবৃত্তি করে। মুখমণ্ডলের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। □

সমাবেশ সমাচার

মালদার কলিগ্রামে মাস্টারমশাইয়ের জন্মশতবর্ষ

শ্রদ্ধেয় 'মাস্টারমশাই' অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ) এবং আর এস এস (উত্তর মালদা জেলা)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় গত ১৯ আগস্ট, মালদা জেলার কলিগ্রাম সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাকক্ষে এক স্মরণসভা তথা নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সভার সূচনা করেন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির প্রাদেশিক সভাপতি রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব রক্ষিত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসার বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক, আর এস এস-এর ক্ষেত্রীয় প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, উত্তর মালদা জেলা সঙ্ঘচালক মোহিতলাল গোস্বামী, জেলাপ্রচারক মথুর হেঁস প্রমুখ। সভা সঞ্চালন করেন ডাঃ দেবাশিস রায়চৌধুরী। প্রায় শতাধিক নাগরিক এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মাস্টারমশাই-এর স্মৃতিচারণ করে বলেন, আমরা ব্যক্তি মাস্টারমশাই-এর নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বকে পূজা করি। অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন, ''মাস্টারমশাই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক। তিনি বলতেন সংগ্রামের পাঠশালায় আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। এই স্লোগান ছিল তাঁর জীবনে। একজন বেঁটেখাটো মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর বাবা যজমান পেশাতে যুক্ত থাকলেও তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নেন। সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক হলেও সকল বিষয়ে দখল ছিল। মাস্টারমশাইয়ের জীবন হাজার হাজার যুবক যুবতীর প্রেরণার উৎস। তাঁর সংগ্রামীজীবন আমাদেরও প্রেরণা।'' ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী।

কল্যাণ আশ্রমের চক্ষু চিকিৎসা শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৮ এবং ১৯ আগস্ট বেলপাহাড়ী ও রাওতোড়া ছাত্রাবাসে দু' দিনের চক্ষু চিকিৎসা শিবির হয়ে গেল। শিবির দুটিতে যথাক্রমে ৭৫৪ ও ৭৮০ জন তাঁদের চক্ষু পরীক্ষা করান। এঁদের মধ্যে ১০১২ চোখের পাওয়ার নির্ণয় করা হয়েছে এবং ৩৩২ জনকে ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচন করা হয়। আশ্রমের পক্ষ থেকে আগামী ১ ও ২ সেপ্টেম্বর নির্বাচিত রোগীদের বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হবে। ছানি অপারেশনের জন্য ৭, ১৪, ২১, ২৮ সেপ্টেম্বর ও ১৫ অক্টোবর ৩৩২ জন রোগীকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করে দেওয়া হবে। এই শিবিরে কলকাতা থেকে ১৮ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করেন।

বহরমপুরে জন্মাষ্টমী উৎসব

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০ বৎসর পূর্তির প্রাক্কালে সহস্রাধিক জনসমাগম হলো জন্মাষ্টমী উৎসবে। সকালবেলায় গঙ্গাজল আনার পর ২০টি ঢাক, ১২টি বিভিন্ন বাদ্য, একাধিক কীর্তনের দল, তিনটি সুসজ্জিত গাড়ি, কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত কিশোর-কিশোরী, সাধু সন্ত ও অগণিত সাধারণ মানুষসহ এক বর্ণাঢ্য মিছিল দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে। দুপুর থেকেই আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। চলে রাত আটটা অবধি। শ্রী রবীন সেনগুপ্তের সঞ্চালনায় কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় ষোল জন শিশু অংশ নেয়। তাদের প্রত্যেককে পুরস্কার হিসাবে গীতা প্রেসের রঙীন শ্রীকৃষ্ণের বই তুলে দেওয়া হয়। বিশেষ স্থানাধিকারীদের সার্টিফিকেট ও শ্রীকৃষ্ণের বাঁধানো ছবি প্রদান করা হয়। ইসকন ও পরিষদের এই জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত ভজন গায়িকা ইতিকণা রায় বড় দল নিয়ে উত্তর ভারতীয় ঘরানার দ্রুত তাল ও লয়ের ভজন গেয়ে দর্শকদের শোনান। ডাঃ এস. এন. চক্রবর্তী বাংলা ঘরানার ভজন পরিবেশন করেন। শাস্ত্রগবেষক রঞ্জিত রায়ের কৃষ্ণকথা, পরিষদের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা রোহিণী প্রসাদ প্রমাণিকের ভাষণও ছিল যথাযথ। অনুষ্ঠান শেষে মানুষজন ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অখণ্ড ভারত দিবস রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ শহরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিদ্যাভারতী ও সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ও অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হয়। এদিন সকালে বিদ্যাভারতী পরিচালিত সুদর্শনপুর সারদা বিদ্যামন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন ও শিশু ভাইবোনদের দেশাত্মবোধক গান ও গীতিনৃত্য পরিবেশিত হয়। বিদ্যাভারতী পরিচালিত ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়েও পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের

উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন এবং নবনির্মিত হলঘরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রধানশিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতীর রায়গঞ্জ শাখার উদ্যোগে রাস্তার পাশে ছোট মঞ্চ বেঁধে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, গীতিনৃত্য ও আবৃত্তি সহকারে অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হয়। অখণ্ড ভারত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার সহসম্পাদক বাসুদেব পাল। সংস্কার ভারতীর কর্মকর্তা বিপ্লব দে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। কিশোরী পল্লবী তালুকদার-এর কণ্ঠে অমিতাভ দাশগুপ্তর কবিতা আবৃত্তি সময়োপযোগী। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য 'বন্দে জননী ভারতবর্ষ' গানে খুব মিলে যায়। তাৎক্ষণিক ক্যুইজে পথচারীদের অংশগ্রহণ খুবই উৎসাহবর্ধক। সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃত করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্ঘ কার্যালয় বিবেকানন্দ ভবনে কলেজ ছাত্র-সম্মেলনে অখণ্ড ভারত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শান্তনু সেন। কালিয়াগঞ্জ শহরেও হিন্দু মিলন মন্দিরেও অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হয়।

কলকাতায় অখণ্ড ভারত দিবস

সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের মধ্যভাগের উদ্যোগে গত ১৪ এবং ১৫ আগস্ট পালিত হলো অখণ্ড ভারত দিবস। ১৪ তারিখ শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে এক প্রকাশ্য সমাবেশে বর্তমান ভারতের অবস্থা এবং অখণ্ড ভারতের সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তারা। সাংস্কৃতিক ভারতের ঐতিহ্য এবং ভাষাগত ঐক্যের বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ সংযোজক প্রণব নন্দ। কবিগুরু রচিত জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-তে যে অখণ্ড ভারতেরই ইঙ্গিত রয়েছে তা জনসাধারণের উদ্দেশে স্মরণ করিয়েছেন সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর শারীরিক প্রমুখ বিভাস মজুমদার। মহানগরের বৌদ্ধিক বিভাগের সদস্য শক্তিশেখর দাস বলেন, আজ তাৎক্ষণিক চাওয়া-পাওয়াকেই জীবনে সর্বস্ব করে দেখানোর কাজে লিপ্ত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। ১৫ তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কেশব ভবনে অখণ্ড ভারতের ভাবনা নিয়ে একটি পারিবারিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যভাগের সন্ধ্যাকালীন শাখাগুলির গণগীত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মোট আটটি সায়মশাখা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সমারোপ বক্তব্যে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়া বনাম ভারত এই ভাবনার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বন্দেমাতরমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শোকসংবাদ

সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের রামমোহন নগর কার্যবাহ সুব্রত নস্করের পিতা শিবপ্রসাদ নস্কর গত ১৮ আগস্ট সকাল সওয়া ছ'টা নাগাদ নিজগৃহে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। স্ত্রীসহ তাঁর দুই পুত্র বর্তমান। উল্লেখ্য তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৌমেন রামমোহন নগরেরই বৌদ্ধিক প্রমুখ।

SATYANARAYAN ACADEMY

(A unique residential coeducational English Medium Secondary School)

Affiliated to CBSE (New Delhi - 2000)

Monthly Charge Rs. 3000/- Onwards with Fooding & Tuition etc. Girl will get 50% concession in tuition fee

Kolkata Address : 7B, Kiran Sankar Roy Road, 4th Floor, Kolkata - 700 001

For Further insertion contact - 9433175048 (M)

আসবাব

বর্ধমান

(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান
যে কোনও স্বর্ণকারকে

সুপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam

EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম ব্রর .....
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥

Factory :- 9732562101

ভারতীয় হকিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার দিন শেষ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রাজিল ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ স্থান পাচ্ছে এ দৃশ্য দূরতম কল্পনাতেও দেখা সম্ভব নয়। কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক বাস্কেটবলে মূল পর্বে টিকিট জোগাড় করতে ব্যর্থ, এমন ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটবে না হলফ করে বলা চলে। কিন্তু হকিতে ভারত এরকম ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্ম দেবে এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফুটবলে ব্রাজিল, বাস্কেটবলে আমেরিকা আর হকিতে ভারত? একপ্রকার মিথেরই নামান্তর। তবে ব্রাজিল, আমেরিকা ফুটবল বাস্কেটবলে সেই আত্মলব্ধ মিথটি ধরে রাখতে সব কিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু ভারত বা ভারতের হকি কর্তা, খেলোয়াড়, কোচ, বৃহৎ অর্থে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা কারুরই কোনও দায়বদ্ধতা নেই ভারতীয় হকির ঐতিহ্য ধরে রাখার ব্যাপারে তাই যা হবার তাই হচ্ছে।

এই জীবদ্দশায় বোধহয় আর ভারতীয় হকি দল বিশ্বকাপ, অলিম্পিকে বিজয়মঞ্চে দাঁড়াচ্ছে অন্তত ব্রোঞ্জ পদকের জন্য, তা আর দেখা হবে না। ভবিষ্যতের প্রজন্মকে ভারতীয় হকির যাবতীয় সাফল্য, গৌরবকে খুঁজতে হবে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে। আর বলতে হবে আমাদের একসময় বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ছিল, আর ছিল অলিম্পিকে ৯ বার চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব গরিমা। এখন সবকিছুই 'বিগ জিরো।' এতবড় একটা দেশ, যে কিনা বিশ্ব অলিম্পিকে পায় ৫৫ নম্বর স্থান। একটাও সোনা তুলতে পারে না। ২টি রূপো, ৪টি ব্রোঞ্জ জিতেই আহ্লাদে আটখানা। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বাড়িতে ডেকে সংবর্ধনা দিচ্ছে ক্রীড়াবিদ্‌দের।

লন্ডনে কোচ মাইকেল নবসের সঙ্গে বিধ্বস্ত ভারতীয় হকি দল।

অবশ্য ওরা এটুকুই করতে পারে। অলিম্পিকে গিয়ে ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ দিতে তাদের বয়েই গেছে। অথচ বিশ্বের প্রথম সারির উন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা অলিম্পিকের সময় মাঠে, কোর্টে, সুইমিং পুলে, জিমনাশিয়ামে ঘুরে ঘুরে নিজের দেশের খেলোয়াড়দের উৎসাহ, উদ্দীপনা জোগায়। তাই ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব ক্রীড়াজগৎ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেশের নেতারা অলিম্পিকের সময়েও নোংরা রাজনীতির খেলায় মেতে থাকে। তাই এদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন। শুধু ক্রীড়াবিদদের দোষ দিয়ে কী লাভ? তাঁরা জীবনের সব সুখ, সখ বিসর্জন দিয়ে খেলার মাঠে পড়ে আছেন। রোদে বৃষ্টিতে অনুশীলন করে ঘাম রক্ত ঝরাছেন। তারপর সবদিক দিয়ে পরিশীলিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে লাভ ৫/৬টি পদক আনছেন, তার জন্য অবশ্যই তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু ভারতীয় হকি দল সর্বাধিক অলিম্পিক পদক জয়ের ঘটনাচক্রে একটা কালো দাগের ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। ১৯৯০-এ লাহোর বিশ্বকাপে শেষ স্থান পেয়েছিল হকি দল। তারপরে এবারের লন্ডন অলিম্পিক। একটাও ম্যাচ জিততে পারল না মাইকেল নবসের ছেলেরা। অথচ শুরুটা চমৎকারভাবে করেছিল ভারত। অতি শক্তিশালী হল্যান্ডের সঙ্গে সমানে লড়ে যায় সন্দীপ, সর্দাররা। ৩-২ গোলে হার দেখে বোঝা যায়নি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতটি। তারপরের ঘটনা ব্যর্থতার হতাশায় বিরামহীন পরিক্রমা, যা দেখে এদেশে কোনও হকি প্রেমিক যে সুইসাইড করেনি, এটাই যথেষ্ট। বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিল এরকম করলে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেন। দেশ জুড়ে গণবিক্ষোভ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এদেশ যে ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত, জাতীয় খেলা রসাতলে গেলে কিছু এসে যায় না। সরকার, ফেডারেশন, আই ও এ, মিডিয়া, জনসাধারণ, কর্পোরেট সংস্থা সব ভুলে, বস্তাপচা চর্বিতচর্বণে ব্যস্ত। অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য বিদেশ থেকে ভাল কোচ, ফিটনেস বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে। দেশে-বিদেশে অনুশীলন ম্যাচ, টুর্নামেন্ট খেলানো হয়েছে। মিত্তল ও সাহারা গোষ্ঠী প্রচুর অর্থ ঢেলেছে ভারতীয় হকির পিছনে। তারপরও এই ফল। কেন এরকম হলো তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে প্রধান কারণটি হলো যতই বিদেশে খেলতে পাঠানো হোক, ভারত কিন্তু বিশ্বের প্রথম ৩/৪টি দেশের সঙ্গে প্রতি বছরে খুব একটা খেলে না। তারকা ডিফেন্ডার সন্দীপ সিং ঠিক জায়গাটাই ধরেছেন। ভারত যত বেশি অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেন, বৃটেনের সঙ্গে খেলবে, তত খেলোয়াড়রা আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবে, নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে পারবে। শুধু আজলান শাহ বা চাম্পিয়নস চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট খেললে হবে না। সেরা দলগুলির সঙ্গে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে বছরে ৭/৮টি ম্যাচ খেলতে হবে। না হলে এই ফল অব্যাহত থাকবে। আর স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে দায়িত্ব নিয়ে সামাল দেবে।

শব্দরূপ-৬৩৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

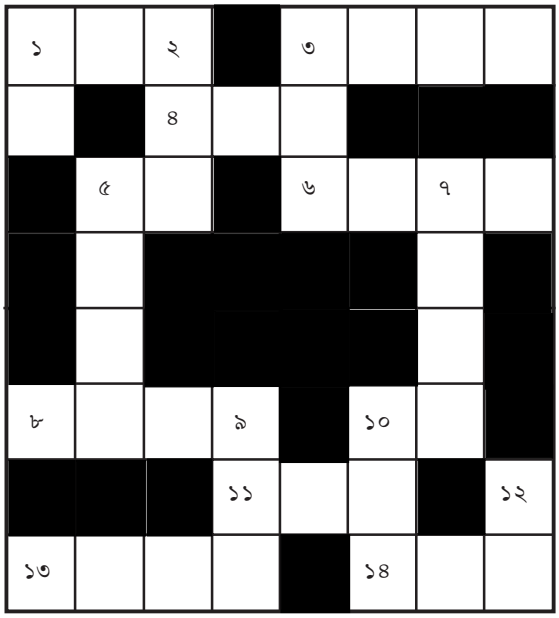

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. নাস্তিক মুনি বিশেষ; আত্মা পরলোক ইত্যাদি যিনি মানেন না, ৩. সংস্কৃত পদ্যের ছন্দবিশেষ (সমগ্র মেঘদূত এই এক ছন্দেই রচিত), ৪. বিশ্ব থেকে এই রোগটি নির্মূল করার জন্য ৫ বৎসরের নিচে শিশুদের মধ্যে ব্যাপক টিকাকরণ কর্মসূচী চলছে, ৫. "যত——, তত পথ", ৬. দুষ্টুমি করলে দিদিমণি এই শাস্তি দেন, ৮. কড়ে আঙুল; কনিষ্ঠা ভগিনী, ১০. বিহারে অবস্থিত তীর্থ যেখানে পিণ্ড দেয়, ১১. মা গঙ্গার বাহন, ১৩. একটি তপোলব্ধ অলৌকিক বিদ্যা, যা অধিগত হলে অনশনজনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না, ১৪. জলদস্যু, এদেশে পর্তুগীজ দস্যুদের বোঝাত।

উপর-নীচ : ১. নীলকণ্ঠ পাখি, ২. পায়রা, ৩. সুযোগ, অবসর, ৫. স্বর্গগঙ্গা, ৭. শারদীয় দুর্গাপূজার পূর্ব অমাবস্যা, ৯. জন্ডিস রোগ, ১০. "মোদের—, মোদের আশা/আমরি বাংলাভাষা", ১২. '—পোড়ে, গোবর হাসে' (প্রবচন)।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৬
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

বি	ং	শ	তি	ভু	জ	■	ম
দু	■	■	■	■	বা	খা	রি
র	ম	■	রা	কা	■	■	য়
■	ন্দি	■	■	শ	ব	ন	ম
নী	রা	জ	না	■	■	ন্দি	■
ল	■	■	গ	জ	■	নী	র
পূ	র্ণি	মা	■	■	■	■	ক্তি
জা	■	জ	গ	ন্না	থ	ধা	ম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৩৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

দুর্গাপূজাবিষয়ক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির

—ঃ পরিচালনায় ঃ—

ভারত সংস্কৃত পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪

ফোন নং : ৯৯৩২১৪০৪৬০/০৩৩-২৫৫৫-৪২৩১

স্থান-বাগবাজার গঙ্গাতীর ভাগবত সভা
বাগবাজার (লঞ্চঘাট) কলকাতা-৩
তারিখ-ইং-২৮.৯.২০১২ থেকে
৭.১০.২০১২ পর্যন্ত

সময় : প্রতিদিন বৈকাল ২-৩০ মিঃ থেকে ৫টা পর্যন্ত
শিবির শুল্ক-১০০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১১

দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে গন্ধর্বমতে বিয়ে করলেন এবং পরিণয় চিহ্নস্বরূপ সোনার আংটি পরিয়ে দিলেন। কিছুদিন দুষ্যন্ত ওখানেই থাকলেন।

ফেরার সময় দুষ্যন্ত শীঘ্রই আশ্রমে আসার কথা দিয়ে গেলেন।

একদিন দুর্বাসা মুনি আশ্রমে পদার্পণ করলেন। দুষ্যন্তের কথা ভাবনারত শকুন্তলা মুনিবরকে খেয়াল করতে পারেননি। ক্রুদ্ধ দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন— যাঁর স্মৃতিতে...

... তুমি মনের মধ্যে ডুবে রয়েছ, সেই তোমাকে ভুলে যাবে। পরে শকুন্তলা দুর্বাসা মুনিকে অনেক আকুতি-মিনতি করলেন।

কন্ব মুনি আশ্রমে ফিরে দিব্যদৃষ্টিতে সবকিছু জানতে পারলেন।

তিনি শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করলেন—

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন
রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া।
তিলকের প্রথম কারাবরণ ঃ শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা। বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ। রাষ্ট্র পরিচালনায় 'খড়ের মানুষের উপদ্রব'।
গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজম। মাধেরার সূর্যমন্দির। বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা।
সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী ও পিনাকপাণি ঘোষ

—: দেবীভাবনা :—

ভিক্ষুদেব ভট্ট

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
3 September - 2012

দাম : ৭.০০ টাকা